সুখেঅসুখে

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকাশনা

৬ষ্ঠ বর্ষ মার্চ ২০১৫ সংখ্যা ২২

ভালো আছে লিভার ভালো আছি আমরা

ভাইরাল হেপাটাইটিসের রকমফের

লিভারতন্ত্রে যখন সার্জারি

লিভার সিরোসিস

লিভার ক্যান্সার

লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন

স্বাস্থ্যকর খাবারে লিভার সুস্থ

[HOTLINE : 10606]

গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি
রোগ নির্ণয়ের সহজ পরীক্ষা

হাইড্রোজেন ব্রেথ টেস্ট

এটি একটি অত্যন্ত কার্যকরি গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি পরীক্ষা যা ক্ষুদ্রান্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার আধিক্য এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য যেমন- ল্যাকটোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ কেন সঠিকভাবে পরিপাক হয় না তা নির্ণয় করা যায়। এই পরীক্ষাটি কাটাছেড়া ছাড়া এবং সম্পূর্ণ ব্যথাহীন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ফলাফল নির্ণয় করতে পারে।

পরীক্ষাটির প্রস্তুতি:

- এই পরীক্ষাটি করতে হয় খালি পেটে অথবা খাবার গ্রহনের ১২ ঘন্টা পর।
- দুটি ব্যাগ দরকার হয়, একটি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রশ্বাস ধরে রাখে অন্যটি ২৫ গ্রাম ল্যাকটোজ, সুক্রোজ বা ফ্রুক্টোজ এর দ্রবন গ্রহনের পর সংগ্রহ করতে হয়।
- প্রথম ব্যাগটিতে অর্থাৎ বেস লাইন ব্রেথ ব্যাগের মুখ খুলে সেখানে সামর্থ অনুযায়ী সবটুকু শ্বাস ছেড়ে দিতে হবে। এবার ব্যাগের মুখটি বন্ধ করে দিতে হবে।
- পুরো দ্রবনটি খেয়ে নিতে হয় এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দ্বিতীয় ব্যাগটির মুখ খুলে, মাউথ পিস দিয়ে শ্বাস সংরক্ষণ করে নিতে হবে ঠিক আগের পদ্ধতিতেই।
- সবশেষে এই দুই ব্যাগ নমুনা শ্বাস, ব্রেথ টেস্ট অ্যানালাইজার দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

• ***বিস্তারিত জানতে :*** ০১৭ ৬৬৬৬ ০৬৭০

LAB AID LTD

ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিক)

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফোন : ৫৮৬১০৭৯৩-৮, ৯৬৭০২১০-৩
ওয়েব : www.labaidgroup.com, ই-মেইল : info@labaidgroup.com

সূচিপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ মার্চ, ২০১৫ সংখ্যা ২২

ভাইরাল হেপাটাইটিসের রকমফের ৫

যকৃততন্ত্রে যখন সার্জারি ৭

লিভার সিরোসিস ১০

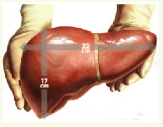
লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন ১১

লিভার ক্যান্সার ঃ শেষ হয়নি আশা ১২

ফ্যাটি লিভার ঃ লিভারে চর্বি রোগ ১৪

পিত্তথলির থলের কথা ১৭

নবজাতকের জন্ডিস! ১৮

হেপাটাইটিস ‘সি’ সচেতনতা ২১

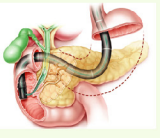
ইআরসিপির যত কথা ২২

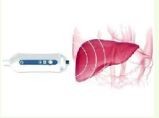
ফাইব্রোস্ক্যান ও লিভার ২৪

অফিসে কাজ অফিসেই গতি! ২৬

সুখে অসুখে

সুখে অসুখে

সম্পাদকীয়

দেহের বিপাকে ও অন্যান্য কিছু শারীরিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে লিভার। গ্লাইকোজেনের সঞ্চয়, প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষণ, ওষুধ বা অন্যান্য রাসায়নিক নির্বিষকরণে লিভারের ভূমিকা অপরিহার্য। এই লিভারই কিন্তু দেহের বৃহত্তম গ্রন্থি। এছাড়া লিভার দেহের বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

অসচেতনতা, বেপরোয়া জীবনযাপন কিংবা ভাইরাসের আক্রমণে কখনো এই লিভার রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ভাইরাল হেপাটাইটিস অন্যতম। যদিও আমরা সাধারণ ভাবে ভাইরাল হেপাটাইটিসকে জন্ডিস বলে থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জন্ডিস মানে কিন্তু ভাইরাল হেপাটাইটিস নয়। ভাইরাস ছাড়া জন্ডিস অন্য কারণেও হতে পারে যেমন- পিত্তনালির পাথর, প্যানক্রিয়াসের নানা রোগও পিত্তনালির টিউমার ইত্যাদি। এছাড়া লিভার সিরোসিস, ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগও হতে পারে লিভারে।

এবারের পুরো সংখ্যাটাই সাজানো হয়েছে লিভারের রোগ-ব্যাধি এবং তার নিরাময় নিয়ে। আশা করছি আপনাদের সংখ্যাটি ভালো লাগবে।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হোন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলুন। সুস্থ থাকবে লিভার, সুস্থ থাকবেন আপনি।

সম্পাদক
ডা. এ এম শামীম

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫ ফোন: 58610793-8, ফ্যাক্স: 88-02-9615497
ই-মেইল : info@labaidgroup.com, ওয়েব : www.labaidgroup.com

ভাইরাল হেপাটাইটিসের রকমফের

অধ্যাপক ডাঃ সেলিমুর রহমান
এমবিবিএস (ঢাকা), এফসিপিএস (মেডিসিন), এফআরসিপি
পোস্টগ্রাজুয়েট ফেলোশিপ ইন লিভার ডিজিজেস অ্যান্ড এন্ডোস্কপি (জাপান)
লিভার ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক, লিভার বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
চেম্বার ঃ ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা।

লিভার আমাদের শরীরের সর্ববৃহৎ এবং অতীব প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এর ওজন ১২০০-১৫০০ গ্রাম এবং এটি আমাদের শরীরের মোট ওজনের ৫০ ভাগের ১ ভাগ। লিভারের মূল কাজ হলো শর্করা, আমিষ ও চর্বি জাতীয় খাবার বিপাক, প্রোটিন ও এলবুমিন এবং রক্ত জমাট বাঁধার উপকরণ উৎপাদন, পিত্তরস উৎপাদন, বিলিরুবিন ও বিভিন্ন ওষুধ বিপাক, ভিটামিন, আয়রন ও খনিজ পদার্থ জমা করা এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা। ভাইরাল হেপাটাইটিস আমাদের দেশে একটি পরিচিত ব্যাধি। যদিও আমরা সাধারণভাবে ভাইরাল হেপাটাইটিসকে জন্ডিস বলে থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জন্ডিস মানে কিন্তু ভাইরাল হেপাটাইটিস নয়। ভাইরাস ছাড়া জন্ডিস অন্য কারণেও হয়ে থাকে। যেমন পিত্তনালির পাথর, প্যানক্রিয়াস ও পিত্তনালির টিউমার। ভাইরাল হেপাটাইটিস সাধারণত হেপাটাইটিস এ,বি,সি,ডি ও ই ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে। ভাইরাসগুলোকে সাধারণত আমরা দুভাগে ভাগ করে থাকি। হেপাটাইটিস এ ও ই পানি অথবা দূষিত খাবারের মাধ্যমে আমাদের শরীরে ঢুকে থাকে। এছাড়া হেপাটাইটিস বি, সি ও ডি রক্ত ও রক্ত উপাদান গ্রহণ এবং সুঁচ অথবা সিরিঞ্জের মাধ্যমে আমাদের শরীরে ঢুকে থাকে।

ভাইরাল হেপাটাইটিস রোগের লক্ষণসমূহ

সাধারণত রোগি ক্ষুধামান্দ্য, বমি বমি ভাব, কিংবা কোন কোন সময় বমি, শরীর ব্যথা, জ্বর জ্বর ও হলুদ রঙয়ের চোখ ও প্রস্রাব নিয়ে আমাদের কাছে আসে। লক্ষণগুলো কোন কোন সময় এত অল্প থাকে যে, তা রোগীর নজর এড়িয়ে যায়। এছাড়া কোন সময় এমনও হতে পারে যে, রোগী রোগের শেষ পর্যায়। যেমন- অবচেতন অবস্থায় আমাদের কাছে আসে।

রোগনির্ণয়ের পরীক্ষাসমূহ

সাধারণত রক্তের দুটি পরীক্ষা করলে বুঝা যায় রোগির হেপাটাইটিস আছে কিনা। যেমন রক্তের বিলিরুবিন ও এস জি পি টি। রোগির রক্তে বিলিরুবিন ও এস জি পি টির মাত্রা সাধারণত বেশি পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এস জি পি টির মাত্রা বেড়ে কয়েক হাজারও হয়ে থাকে। এছাড়াও যদি আমরা জানতে চাই কোন্ ভাইরাস দিয়ে হেপাটাইটিস হয়েছে তাহলে রক্তে ভাইরাসগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে কারণ নির্ণয় করা সম্ভব।

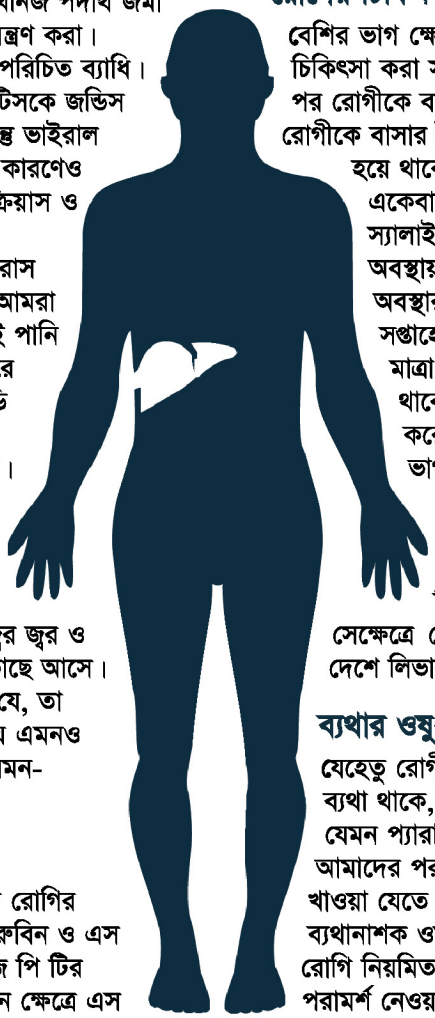

রোগের চিকিৎসা

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হালকাভাবে আক্রান্ত রোগীকে বাসায় রেখেই চিকিৎসা করা সম্ভব। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগনির্ণয়ের পর রোগীকে বাসায় সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। রোগীকে বাসার তৈরি স্বাভাবিক খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। অতিরিক্ত বমি হলেও রোগী যদি মুখে একেবারে খেতে না পারে, সেক্ষেত্রে শিরাপথে স্যালাইনের পরামর্শ দেওয়া হয়। লক্ষণগুলো প্রাথমিক অবস্থায় যত বেশি থাকে, পরবর্তীতে আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি হয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগী ৩ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। তবে রোগের মাত্রা যদি বেশি হয় এবং রোগীর অবস্থা যদি জটিল থাকে, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে (শতকরা ৯০ ভাগের বেশি) রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী এমন জটিল হয়ে যায় যেটাকে আমরা লিভার ফেইলর বলে থাকি। সেক্ষেত্রে রোগীকে আই সি ইউতে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর জীবনের ঝুঁকি থাকে এবং প্রয়োজনে উন্নত দেশে লিভার প্রতিস্থাপনের চিকিৎসা করা হয়।

ব্যথার ওষুধ খাওয়া

যেহেতু রোগীর প্রাথমিক অবস্থায় জ্বর জ্বর, গা ব্যথা ও শরীর ব্যথা থাকে, সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যথা ও জ্বরের জন্য ওষুধ যেমন প্যারাসিটামল খাওয়ার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হলো, প্রয়োজনে অল্প পরিমাণ প্যারাসিটামল খাওয়া যেতে পারে। তবে বেশি পরিমাণ প্যারাসিটামল ও ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়। অন্যান্য ওষুধ যেগুলো রোগি নিয়মিত সেবন করে সে ব্যাপারেও অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

রোগ প্রতিরোধে করণীয়

যেহেতু আমরা প্রথমে বলেছি যে, ভাইরাসগুলো আমাদের শরীরে দুভাবে ঢুকে থাকে, সেহেতু প্রতিরোধের ব্যাপারটিও দুটি ক্ষেত্রে ভিন্ন। যেমন হেপাটাইটিস এ ও ই ভাইরাস প্রতিরোধে আমাদের বিশুদ্ধ পানি ও বিশুদ্ধ খাবার গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। পানি সম্ভব হলে ফুটিয়ে পান করা উচিৎ। এছাড়া বাইরের কাঁচা খাবার বিশেষ করে নিম্নমানের ফাস্ট ফুড, ফুচকা, চটপটি, বিভিন্ন রকম শরবত যেমন- আখের রস, লেবুর শরবত না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। এছাড়া বাচ্চাদেরকে সম্ভব হলে হেপাটাইটিস এ এর ভ্যাকসিন নিতে হবে। হেপাটাইটিস বি ও সি এর প্রতিরোধে আমাদেরকে একবার (One time) ব্যবহারযোগ্য সিরিঞ্জ অথবা সুঁচ ব্যবহার করা উচিত।এছাড়া রক্ত অথবা রক্ত উপাদান গ্রহণের ক্ষেত্রেও আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অবশ্যই হেপাটাইটিস বি এবং সি পরীক্ষা করে রক্ত গ্রহণ করা উচিত।এছাড়া আমাদের দেশে ছেলেদের মুসলমানি (Circumcision), মেয়েদের নাক ও কান ফুটানোর সময় এবং দাঁতের চিকিৎসায় ও অন্যান্য শৈল্য চিকিৎসায় বিশুদ্ধ ছুরি, কাঁচি এবং সুঁচ ব্যবহার করা উচিৎ। এছাড়া সব বয়সের নারী-পুরুষকে বি ভাইরাস প্রতিরোধে অবশ্যই হেপাটাইটিস বি- এর ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত।

প্রসূতিকালীন সতর্কতা

প্রসূতিকালীন ভাইরাল হেপাটাইটিস আক্রান্ত রোগীর ব্যাপারে আমাদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ প্রসূতিকালীন ভাইরাল হেপাটাইটিসে মৃত্যুর ঝুঁকি অন্যান্য সময়ের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। প্রসূতি মা যদি হেপাটাইটিস বি অথবা সি তে আক্রান্ত থাকেন, সে ক্ষেত্রে তার সন্তানকে হেপাটাইটিস থেকে রক্ষার জন্য অতিরিক্ত সাবধানতা এবং বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে জন্মের ১২ ঘণ্টার মধ্যে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন ও ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Immunoglobulin) দেওয়া জরুরি।

অপচিকিৎসা

আমরা প্রায়ই দেখে থাকি ভাইরাল হেপাটাইটিস রোগীকে বিভিন্ন রকম অপচিকিৎসার শিকার হতে হয়। যেমন– হাত ধোয়ানো, মালা পরানো, বিভিন্ন রকম গাছের পাতা ও রস খাওয়ানো হয়। এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ, অবশ্যই এগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। এগুলো কোন উপকার তো করেই না, বরং রোগীর মারাত্মক শারীরিক ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে এবং কখনো মৃত্যুর কারণ হয়েও দাঁড়ায়।

হেপাটাইটিস

লিভারের এই মারাত্মক রোগটি ভাইরাস দ্বারা ঘটে থাকে

রোগের উপসর্গ

জ্বর এবং দুর্বলতা

ক্ষুধা কমে যাওয়া

বমি বমি ভাব/বমি

পেটব্যথা

ত্বক ও চোখ হলদে ভাব

হেপাটাইটিস এ এবং ই সাধারণত দূষিত পানি দ্বারা সংক্রমিত হয়

ভাল ভাবে খাবার রান্না করতে হবে এবং পানি ফুঁটিয়ে পান করতে হবে

খাবার আগে-পরে এবং টয়লেট থেকে ফিরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া অভ্যাস করতে হবে

প্রতিরোধ

নিজের এবং পরিবারের প্রতি সচেতনতা

হেপাটাইটিস বি এবং সি সাধারণত সংক্রমিত হয় দূষিত রক্ত এবং অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে

ইনজেকশন নেবার সময় ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে

যৌন মিলনে কন্ডম ব্যবহার করুন

অন্যের সেভিং রেজার, টুথ ব্রাশ এবং নেইল কার্টার ব্যবহার করা যাবে না

মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন

নিরাপদ রক্ত নিচ্ছেন কিনা, নিশ্চিত হয়ে নিন

যকৃততন্ত্রে যখন সার্জারি

অধ্যাপক জুলফিকার রহমান খান

এফসিপিএস (সার্জারি), এফআরসিএস (ইউকে)
অধ্যাপক, হেপাটোবিলিয়ারি ও প্যানক্রিয়াটিক সার্জারি বিভাগ
লিভার, প্যানক্রিয়েটিক, বিলিয়ারি এবং ল্যাপারোস্কপিক সার্জন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
চেম্বারঃ ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা।

হেপাটোবিলিয়ারি তন্ত্র মানবদেহের লিভার, গলব্লাডার, পিত্তথলি ও পিত্তনালি এবং অগ্ন্যাশয়কে বুঝায়। এই তিনটি অঙ্গে নানা রকম রোগ হয়। কিছু রোগ ওষুধ দ্বারা চিকিৎসায় রোগী আরোগ্য লাভ করে। আবার কিছু রোগী শৈল্য (সার্জারি) চিকিৎসাতে আরোগ্য লাভ করে। আমরা হেপাটোবিলিয়ারি তন্ত্রের সার্জিক্যাল রোগ নিয়ে আলোচনা করব।

নিম্নলিখিত রোগের জন্য সার্জারি বা শৈল্য চিকিৎসা করতে হয়।

লিভার

ক) লিভার টিউমার
খ) লিভার সিস্ট
গ) লিভারের ফোঁড়া
ঘ) লিভার সিরোসিস

পিত্তথলি-পিত্তনালি

ক) পিত্তথলির পাথর, ক্যান্সার
খ) পিত্তনালির পাথর, ক্যান্সার, সিস্ট।

অগ্ন্যাশয়

ক) প্রদাহ, খ) পাথর, গ) সিস্ট ও ঘ) টিউমার

লিভার টিউমার ২ ধরনের হয়
১. প্রাথমিক লিভার টিউমার ও ২. সেকেন্ডারি লিভার টিউমার।

প্রাইমারি লিভার টিউমার

এই টিউমার বা ক্যান্সার প্রথম থেকেই লিভারে শুরু হয়। প্রায় ৯০ শতাংশ টিউমার হেপাটোসেলুলার ক্যান্সার। এই ক্যান্সার সাধারণত হেপাটাইটিস বি ও সি দ্বারা আক্রান্ত রোগির হয়। ফলে হেপাটোসেলুলার বি ভ্যাকসিন দিলে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু যেহেতু হেপাটাইটিস সি- এর জন্য কোন ভ্যাকসিন না থাকতে সি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত রোগির টিউমার প্রতিরোধ করা সম্ভব না। এছাড়া যে কোন ক্রনিক লিভার ডিজিস থেকে লিভার টিউমার বা ক্যান্সারের উৎপত্তি হতে পারে। লিভার ক্যান্সার দ্বারা আক্রান্ত হলে সর্বপ্রথমে রোগির খাবারে রুচি ও ওজন কমে যায়। পরবর্তী সময় পেটের ডানদিকে ওপরের অংশে চাকা দেখা যায়। এমনকি জন্ডিসও হতে পারে। রক্ত পরীক্ষা, আল্ট্রাসাউন্ড অথবা সিটি স্ক্যান করে রোগনির্ণয় করা যায়। যে কোন টিউমারের মত লিভার টিউমার খুবই প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করতে পারলে অপারেশন করে সম্পূর্ণ রোগমুক্তি সম্ভব। হেপাটাইটিস বি ও সি আক্রান্ত রোগীদের প্রতি ৬ মাস অন্তর রক্ত পরীক্ষা ও আল্ট্রাসনোগ্রাফি করে প্রাথমিক অবস্থায় লিভার ক্যান্সার নির্ণয় সম্ভব।

সেকেন্ডারি লিভার টিউমার

মানব শরীরের অন্য কোন অঙ্গের ক্যান্সার লিভারে ছড়িয়ে পড়লে যে টিউমার হয় তাকে সেকেন্ডারি লিভার টিউমার বলা হয়। সাধারণত পাকস্থলী, ক্ষুদ্র ও বৃহদঅন্ত্র, ফুসফুস, কিডনি, স্তন ক্যান্সার থেকে সেকেন্ডারি লিভার বি ও সি হয়। এ ক্ষেত্রে লিভার টিউমার যদি খুবই ছোট থাকে তবে অপারেশন করে টিউমার অপারেশন করা সম্ভব। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপারেশন করা যায় না। সেক্ষেত্রে কেমোথেরাপি অথবা অন্যান্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়।

পিত্তথলি ও পিত্তনালির রোগ

পিত্তথলির পাথর সব থেকে কমন রোগগুলোর একটি। লেপারোস্কপির সাহায্যে পিত্তথলির পাথর অপারেশন সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি।

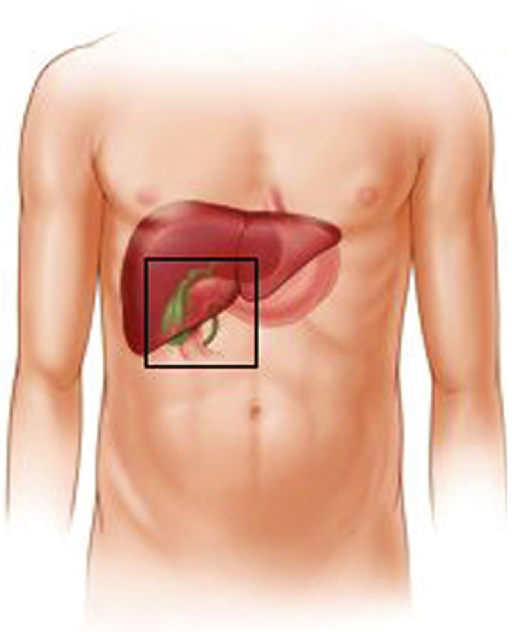

পিত্তনালির পাথর

সাধারণত বেশিরভাগ রোগী পেটে ব্যথা ও জন্ডিস নিয়ে আসে। পিত্তনালির পাথর অপারেশন অথবা ইআরসিপি দুভাবেই অপসারণ করা যায়।

পিত্তনালির ক্যান্সার হলে রোগী সাধারণত জন্ডিস নিয়ে আসে। বেশির ভাগ রোগীর অপারেশন করা যায় না। তবে পিত্তনালির নিচের দিকে টিউমার হলে অপারেশন করে আরোগ্য লাভ সম্ভব। যেসব রোগী অপারেশন করা যায় না তাদের ERCP মাধ্যমে Stenting করে নিলে জন্ডিস কমে যায়।

পিত্তথলির ক্যান্সার

পিত্তথলির ক্যান্সার যদি খুবই প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে তবে অপারেশন করে আরোগ্য লাভ সম্ভব। তবে বেশির ভাগ রোগী খুবই শেষ অবস্থায় আসে।

প্যানক্রিয়েজের নানান রোগ

প্যানক্রিয়েজ মানবদেহের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডাইজেস্টিভ অরগান। বাংলায় বলা হয় অগ্ন্যাশয়। প্যানক্রিয়েজ মানবদেহের পেটের ভিতরে পাকস্থলীর পিছনে অবস্থিত। ওজন প্রায় ৮০ গ্রাম। এটি দুই ধরনের রস নিঃসরণ করে। ডাইজেস্টিভ এনজাইমও হরমোন। এনজাইম ক্ষুদ্র অন্ত্রে নিঃসরিত হয়। এটি কার্বোহাইড্রেড, ফ্যাট ও প্রোটিনজাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে। হরমোনের মধ্যে ইনসুলিন ও গ্লুকাগন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। প্যানক্রিয়েজের নানা রকমের রোগ হতে পারে। এর মধ্যে প্যানক্রিয়েজের প্রদাহ, পাথর এবং টিউমার উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি রোগ এবং এর চিকিৎসা খুবই জটিল।

প্যানক্রিয়েজের প্রদাহ

প্যানক্রিয়েজে দুই ধরনের প্রদাহ হয়।
১। অতিমাত্রায় প্রদাহ (Acute Pancreatitis)
২। ক্রনিক প্রদাহ (Chronic Pancreatitis)

অতিমাত্রায় প্রদাহ (Acute Pancreatitis)

অতি মাত্রায় প্রদাহের কারণ হচ্ছে পিত্তথলি ও পিত্তনালির পাথর, অতিমাত্রায় মদ্যপান, রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি এবং জন্মগত ত্রুটি। এছাড়া কোন নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াও এই প্রদাহ হতে পারে।

উপসর্গ

পেটের উপরের দিকে তীব্র ব্যথা শুরু হয় যা পেটের পিছনের দিকে ছড়িয়ে পড়ে, পেটের ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে এর সঙ্গে বমি হতে পারে। পেটে ব্যথা এত তীব্র হয় যে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

রোগনির্ণয়

রক্ত পরীক্ষা: রক্তে অ্যামাইলেজ (Amylase) এর মাত্রা, আল্ট্রাসাউন্ড এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান এবং ইআরসিপি'র (ERCP) মাধ্যমে রোগনির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

প্যানক্রিয়েজের প্রদাহ একটি জটিল রোগ। ইমারজেন্সি চিকিৎসার প্রয়োজন। রোগীকে অবশ্যই কোন হাসপাতালে ভর্তি করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা করাতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে আইসিইউ'র (ICU) সাহায্য লাগতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে অপারেশন প্রয়োজন হতে পারে। যদি প্রদাহ পিত্তথলি ও পিত্তনালির পাথরের জন্য হয় তবে প্রদাহ কমার পরে সাধারণত চার থেকে ছয় সপ্তাহ পর পিত্তথলির পাথরের অপারেশন করাতে হবে।

ক্রনিক প্রদাহ (প্যানক্রিয়েটাইটিস)

অতিমাত্রার প্রদাহ থেকে ক্রনিক প্যানক্রিয়েটাইটিস হতে পারে। এই ক্ষেত্রে রোগীর ঘন ঘন পেটে ব্যথা হয়। খাদ্য হজম হয় না। ওজন কমে যায়। ফেনাযুক্ত পায়খানা হয়। রোগীর ডায়াবেটিস রোগ হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

রক্ত পরীক্ষা, আল্ট্রাসাউন্ড এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সিটিস্ক্যান এবং ইআরসিপি (ERCP) এর মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা করাতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে অপারেশন করা প্রয়োজন হয়। যদি প্যানক্রিয়েজের নালি বাধাগ্রস্থ হয় তবে অবশ্যই অপারেশন করতে হবে। চর্বি জাতীয় খাবার যেমন- ডিম, দুধ, গরুর মাংস, খাসির মাংস, যে কোন তৈলাক্ত খাদ্য কম খেতে হবে। এছাড়া খাবারের পরিমান কম এবং ক্যালরির মান ঠিক রাখার জন্য অল্প করে বেশি বার খাওয়া যেতে পারে।

প্যানক্রিয়েটিক টিউমার

প্যানক্রিয়েজের টিউমার বেশির ভাগই ক্যানসার হয়। বিনাইন টিউমার খুবই কম। সেজন্য প্যানক্রিয়েজের টিউমার মানেই ক্যান্সার। মাঝ বয়সী পুরুষ এবং মহিলা সমান হারে আক্রান্ত হতে পারে। প্যানক্রিয়েজের টিউমার সাধারণত দুই ধরণের হয়। মাথা (Head) এবং বডি (Body) তে টিউমার হয়। বেশির ভাগ টিউমার মাথায় আক্রান্ত হয়। প্যানক্রিয়েজের মাথায় টিউমারের রোগী জন্ডিস পেটে ব্যথা, পেটে চাকা নিয়ে আসে। বেশির ভাগই রোগীর রোগ ডায়াগনোসিস হয় অগ্রসর (Advanced Stage) পর্যায়।

রোগনির্ণয়

প্রাথমিক ইতিহাস, রক্ত পরীক্ষা, আল্ট্রাসাউন্ড, সিটিস্ক্যান, এমআরআই এবং ইআরসিপি'র মাধ্যমে রোগনির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

টিউমার যদি খুব প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে তবে অপারেশন করে সম্পূর্ণ রোগ উপশম করা সম্ভব। তবে দেখা গেছে বেশির ভাগ রোগীই শেষ অবস্থায় আসে। তখন সার্জারির ভূমিকা খুবই কম থাকে। অপারেশন খুবই জটিল। অবশ্যই বিশেষজ্ঞ সার্জন দ্বারা করা উচিত। অপারেশন দুই ধরনের- কিউরেটিভ এবং পেলিয়েটিভ (Palliative)। কিউরেটিভ Curative) অপারেশন করতে পারলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ সম্ভব। পেলিয়েটিভ অপারেশনে আরোগ্য লাভ সম্ভব নয়। তবে কিছু কিছু উপসর্গ যেমন-জন্ডিস, খাদ্যনালি অবস্ট্রাকশন থেকে সাময়িক নিরাময় হয়। এছাড়া ERCP এর মাধ্যমে Stenting করালে সাময়িক উপশম লাভ করা যায়।

প্যানক্রিয়েজ এবং ডায়াবেটিস

প্যানক্রিয়েজের মধ্যে আইলেট সেল নামক কিছু কোষ থাকে। এই কোষগুলো ইনসুলিন নামক হরমোন নিঃসরণ করে। ইনসুলিন রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এই কোষগুলো যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে ইনসুলিনের নিঃসরণ কম হবে, ফলে রোগীর ডায়াবেটিস রোগ দেখা দিবে। ক্রনিক প্রদাহ বা সার্জারি করে প্যানক্রিয়েজের টিউমার অপসারণ করা হলে রোগী ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

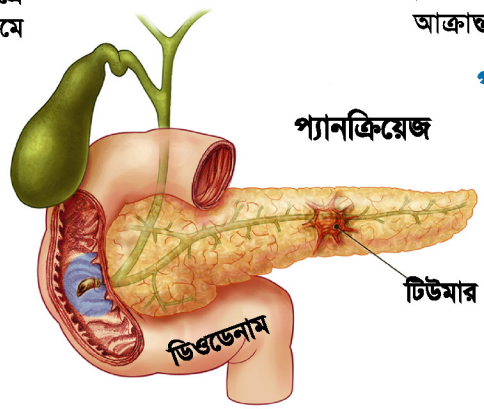

প্যানক্রিয়েজ এবং জন্ডিস

পিত্তনালির নিম্ন অংশ প্যানক্রিয়েজের মাথার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়। যদি প্যানক্রিয়েজের মাথায় কোন টিউমার হয় তবে অতিরিক্ত চাপে পিত্তনালির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে রোগীর জন্ডিস হয়। কোন রোগীর জন্ডিস হলে অবশ্যই রক্ত পরীক্ষা এবং আল্ট্রাসাউন্ড করে সঠিক রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করাতে হবে। পিত্তনালির প্রবাহ বাধা গ্রস্থের ফলে যে জন্ডিস হয় তাকে সার্জিকেল জন্ডিস বলে।

প্যানক্রিয়েজের পাথর

ক্রনিক প্যানক্রিয়েটাইটিস থেকে পাথর হতে পারে। রোগীর পেটে মাঝে মাঝে তীব্র ব্যথা হয়। খাদ্য হজম হয় না। ডায়াবেটিস দেখা যায়।

রোগনির্ণয়

পেটের এক্স-রে, আল্ট্রাসাউন্ড এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইআরসিপি করে রোগনির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

যদি খুব ঘন ঘন পেটে ব্যথা হয় তবে অপারেশন করে রোগী লাভবান হয়। রোগটি জটিল বিধায় অপারেশন বিশেষজ্ঞ সার্জন দ্বারা করা উচিত।

উপসংহার

প্যানক্রিয়েজ মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর অরগান। এর প্রতিটি রোগই অত্যন্ত জটিল। চিকিৎসাও খুব ব্যয়বহুল এবং জটিল। বর্তমানে আমাদের দেশে এর প্রতিটি রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা সম্ভব।

লিভার সিরোসিস

অধ্যাপক (ডাঃ) স্বপন চন্দ্র ধর
এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন), এমডি (গ্যাস্ট্রো)
এমএসিজি (ইউএসএ), এফআরসিপি (এডিন)
মেডিসিন, পরিপাকতন্ত্র ও লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগ
এস, এস, এম, সি ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা।
চেম্বারঃ ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা।

লিভার সিরোসিস লিভারের একটি মারাত্মক ব্যাধি। এই রোগে লিভারের কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং এক সময় রোগী মৃত্যুর মুখে পতিত হয়।

লিভার সিরোসিস কী?

লিভার সিরোসিস লিভারের দীর্ঘমেয়াদি একটি রোগ। লিভারের প্রদাহজনিত কারণে লিভারের কোষগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে লিভারের ভিতরের স্বাভাবিক গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন হয় এবং লিভারের ভিতরে ফাইব্রোসিস হয়ে লিভারটি ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যায় এবং ইহার কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।

লিভার সিরোসিস- এর কারণ

বিভিন্ন কারণে লিভার সিরোসিস হতে পারে। যেমন–

১। হেপাটাইটিস 'বি' এবং 'সি' ভাইরাস।
২। অ্যালকোহল।
৩। কিছু কিছু ওষুধ যেমন INH এবং Amiodarone।
৪। অটোইমিউন হেপাটাইটিস।
৫। উইলসন্স ডিজিস।
৬। হেমোক্রোমাটাইটিস এবং
৭। ফ্যাটি লিভার ডিজিস।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও কোন কারণ পাওয়া যায় না। সেগুলোকে ক্রিপটোজেনিক সিরোসিস বলা হয়। উপরোক্ত কারণগুলোর মধ্যে আমাদের দেশে হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাস লিভার সিরোসিসের প্রধান কারণ। অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্বে লিভার সিরোসিসের অন্যতম কারণ হল অ্যালকোহল।

লিভার সিরোসিস- এর লক্ষণসমূহ

লিভার সিরোসিস দুই প্রকারের যথা (১) কমপেনসেটেড ও (২) ডিকমপেনসেটেড। কমপেনসেটেড সিরোসিসে লিভারের ভিতরে কিছু কিছু কোষ নষ্ট হয়ে যায় এবং অল্প মাত্রায় ফাইব্রোসিস হয়। এক্ষেত্রে লিভারের কার্যক্ষমতা ঠিক থাকে এবং রোগীর দেহে সাধারণত কোন লক্ষণ দেখা দেয় না।

ডিকমপেনসেটেড সিরোসিসে রোগীর শরীরে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। রোগীর চোখ হলুদ হয়ে যায় অর্থাৎ জন্ডিস হয়, পায়ে ও পেটে পানি আসে, ক্ষুদামান্দ্য, শরীর ক্ষীণ হয়ে যায়, গায়ে অল্প অল্প জ্বর থাকে এবং প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়। এমন কি রক্তবমি ও কালো পায়খানাও হতে পারে।

প্রতিকার

কমপেনসেটেড সিরোসিস হলে চিকিৎসা দ্বারা কোন রোগীর সম্পূর্ন সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি হেপাটাটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাস দ্বারা সিরোসিস হয়, তবে আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে পুরোপুরি সুস্থ হওয়া সম্ভব হয়।

কিন্তু ডিসপেনসেটেড সিরোসিস এর কোন সু-চিকিৎসা নেই। আধুনিক চিকিৎসা দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে রোগের গতি পরিবর্তন করা যায় কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ করা যায় না। এক্ষেত্রে সঠিক চিকিৎসা হলো লিভার প্রতিস্থাপন করা। লিভার প্রতিস্থাপন হলো রোগীর লিভার ফেলে দিয়ে সুস্থ মানুষের লিভার রোগীর পেটে লাগানো। লিভার প্রতিস্থাপন দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোপুরি সুস্থ করা সম্ভব। কিন্তু লিভার প্রতিস্থাপন অত্যন্ত ব্যায়বহুল। স্বল্প পরিসরে দেশে, ভারতে এবং উন্নত দেশগুলোতে লিভার প্রতিস্থাপন করা যায়।

প্রতিরোধ

Prevention is better than cure –এই বাক্যটি প্রতিটি রোগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিশেষ করে যে সকল রোগের কোন curative চিকিৎসা নেই। তাই আমাদের প্রত্যেককেই এই রোগ যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ রাখা উচিত।

প্রতিরোধের উপায়

১। ছোট-বড় সকলকে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের টিকা দিতে হবে।
২। হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' যাতে শরীরে ঢুকতে না পারে সে জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।
৩। অ্যালকোহল পান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
৪। জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

লিভার রোগের বিভিন্ন ধাপ

লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন

অধ্যাপক ডাঃ নূরুদ্দীন আহমদ
এমবিবিএস, এফসিপিএস
লিভার রোগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (জাপান ও ব্যাংকক)
লিভার ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক, লিভার বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (পিজি হাসপাতাল), ঢাকা।
চেম্বারঃ ল্যাবএইড লিমিটেড, ঢাকা।

লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন হলো লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন রক্ষার সর্বশেষ পদক্ষেপ। কারও হেপাটাইসিস 'বি' বা 'সি' ভাইরাস থাকলে এবং সময়মতো তা প্রতিরোধ না করলে ধীরে ধীরে লিভার সিরোসিস বা ক্যান্সারে রূপ নেয়। এ ধরনের রোগীদের শেষ চিকিৎসাই হচ্ছে লিভার প্রতিস্থাপন। অপারেশনের মাধ্যমে এই রোগাক্রান্ত লিভার অপসারণ করে সেই স্থানে দাতা ব্যক্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক সুস্থ লিভার প্রতিস্থাপন করে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন করা যায়। মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহল বা লিভারের জন্য ক্ষতিকর ওষুধ অতিরিক্ত খেলেও লিভারে প্রদাহ হবার শঙ্কা থাকে। প্রদাহ অনেক দিন থাকলে লিভারে Fibrosis হয়ে লিভার কোষের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

ক্যাডাভেরিক লিভার দিয়ে। কিন্তু ক্যাডাভেরিক লিভার পাওয়া খুবই কঠিন। ক্যাডাভেরিক লিভারের স্বল্পতার জন্য শল্য চিকিৎসকরা পরবর্তিতে লিভিং রিলেটেড লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন শুরু করেন। লিভিং রিলেটেড পদ্ধতিতে আত্মীয় যেমন ভাই, বোন, বাবা, মায়ের শরীরের লিভারের একটি অংশ নিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। মানবদেহের লিভার একটি অঙ্গ হলেও এটি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি ডান অংশ ও অন্যটি বাম অংশ। যে কোন অংশই প্রতিস্থাপন করা যায়। লিভারের একটি অংশ কেটে ফেলে দিলেও তেমন কান অসুবিধে হয় না। কারণ লিভারের রিজেনারেটিভ ক্ষমতা থাকায় ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে লিভার আগের আকার ধারণ করে। লিভার

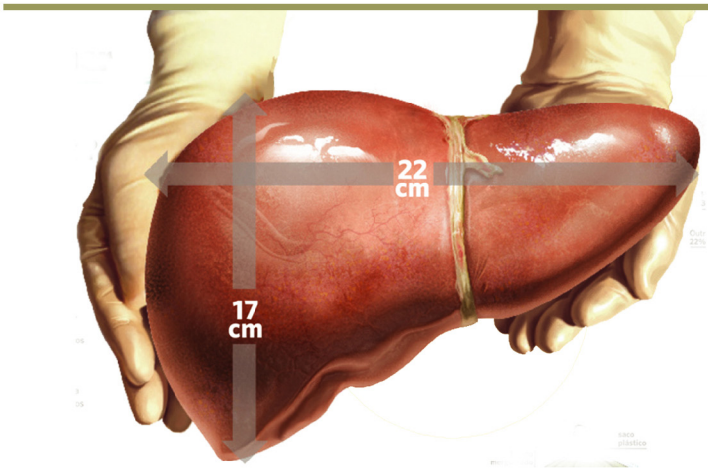

মানবদেহের লিভার একটি অঙ্গ হলেও এটি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি ডান অংশ ও অন্যটি বাম অংশ। যে কোন অংশই প্রতিস্থাপন করা যায়

একবার সিরোসিস হলে লিভার আর কখনোই আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। সেক্ষেত্রে একমাত্র চিকিৎসা হলো ট্রান্সপ্লান্টেশন। আবার লিভার সিরোসিস থেকে লিভার ক্যান্সার হতে পারে। লিভার সিরোসিস এবং লিভার ক্যান্সার একসঙ্গে থাকলে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনই সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা।

কিছু মেটাবলিক অসুখের জন্যও লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন করা হয়। শিশুদের জন্মগত কিছু বিলিয়ারি অসুখের জন্যও করা হয় লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন। সেক্ষেত্রে সাধারণত মা অথবা বাবার লিভারের অংশ প্রতিস্থাপন করা হয়।

লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন দুই ধরনের ক্যাডাভেরিক ও লিভিং রিলেটেড লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন। প্রথমদিকে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন শুরু হয়েছিল

ট্রান্সপ্লান্টেশন করার সময় দুটি অপারেশন থিয়েটার দুই টিম আলাদাভাবে কাজ করে। এক রুমে লিভার দাতা এবং অন্য রুমে লিভার গ্রহীতার অপারেশন হয়। গ্রহীতার অকার্যকর লিভার সম্পূর্ণ অপারেশনের মাধ্যমে অপসারণ করে দাতার লিভারের অংশ প্রতিস্থাপন করা হয়। পুরো অপারেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় ১২-১৪ ঘণ্টা লাগে।

সারা বিশ্বে লিভার গ্রহীতার মৃত্যুঝুঁকি মাত্র ১০ শতাংশ হলেও লিভার দাতার কোনো মৃত্যুঝুঁকি নেই বললেই চলে। সুস্থ লোকের দেহ থেকে লিভারের কিছু অংশ কেটে নিয়ে সংযোজন করা হয়। সাধারণত ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যেই দাতার লিভার আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

লিভার ক্যান্সার

শেষ হয়নি আশা

ডাঃ মামুন-আল-মাহতাব (স্বপ্নীল)
সহযোগী অধ্যাপক, লিভার বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
লিভার, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিশেষজ্ঞ
ইন্টারভেনশনাল এন্ডোস্কোপিস্ট
চেম্বারঃ ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা।

ক্যান্সার মানেই আতঙ্ক, আর তা যদি হয় লিভার ক্যান্সার তাহলে তো কথাই নেই। এ কথা সত্যি যে, শরীরের বেশির ভাগ ক্যান্সারের মতোই লিভার ক্যান্সার নিরাময় এখনও আমাদের সাধ্যের অতীত। তবে পাশাপাশি একথাও সত্যি, লিভার ক্যান্সার চিকিৎসায় সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের অগ্রগতিও কম নয়। সবচেয়ে বড় কথা, আজ বাংলাদেশে বসেই লিভার ক্যান্সারের আধুনিক চিকিৎসাগুলো পাওয়া সম্ভব। আর সেই সব আশার কথা নিয়েই লেখাটি।

লিভার ক্যান্সার কেন হয়?

সারা পৃথিবীতেই লিভার ক্যান্সার ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। প্রতি বছর পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে চার লাখ মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হন। পুরুষদের ক্ষেত্রে মোট ক্যান্সারের ৭.৫ ভাগ লিভার ক্যান্সার, আর মহিলাদের বেলায় এ সংখ্যাটি ৩.২ ভাগ। আশঙ্কাজনক সত্যটি এই যে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এ শিয়ায় লিভার ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব পৃথিবীর অন্য যে কোন অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া আমাদের সাম্প্রতিক গবেষণায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বাংলাদেশে রোগীরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় গড়ে প্রায় ২০ বছর কম বয়সে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। এদেশে ক্যান্সারে মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ লিভার ক্যান্সার।

বিশ্বব্যাপী লিভার ক্যান্সারের মূল কারণ হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস আর অ্যালকোহল। আমাদের দেশে অবশ্য হেপাটাইটিস বি আসল খলনায়ক, কারণ এদেশে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ এ ভাইরাসের বাহক বা HBsAg পজেটিভ। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত ৫ থেকে ১০ শতাংশ লোক জীবনের কোন এক পর্যায়ে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

লিভার ক্যান্সারের লক্ষণ

যে কোন বয়সের মানুষই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। লিভার ক্যান্সারের ঝুকি পুরুষদের ক্ষেত্রে মহিলাদের চেয়ে ৪ থেকে ৬ গুণ বেশি। সাধারণত ক্যান্সার হওয়ার আগে লিভারে সিরোসিস দেখা দেয়, তবে এর ব্যতিক্রম হওয়াটাও অস্বাভাবিক না।

লিভারে ক্যান্সার কোষের বিস্তার

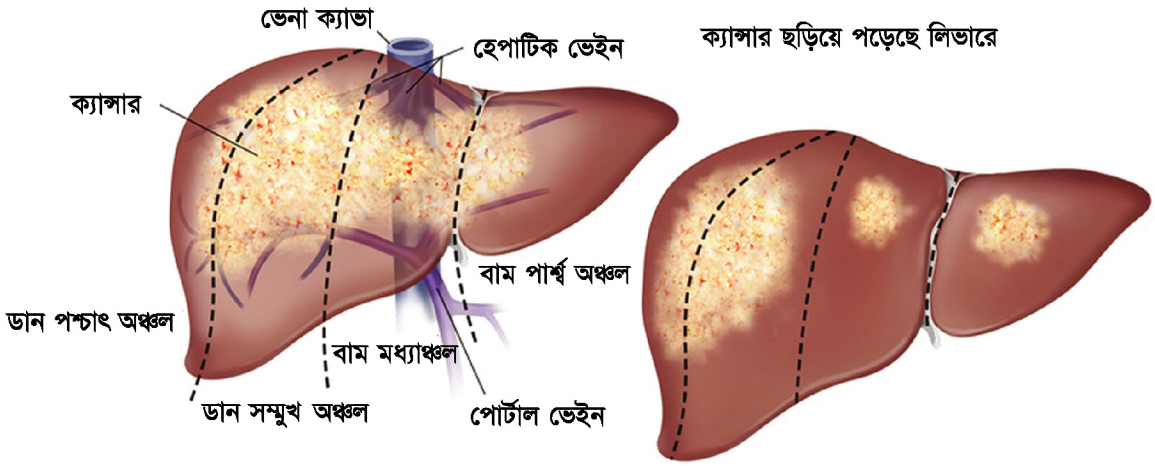

লিভার ক্যান্সারের রোগীরা প্রায়ই পেটের ডান পাশে ওপরের দিকে অথবা বুকের ঠিক নিচে মাঝ বরাবর ব্যথা অনুভব করেন যার তীব্রতা রোগী ভেদে বিভিন্ন রকম। সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়া, পেট ফাঁপা, ওজন কমে যাওয়া আর হালকা জ্বর জ্বর ভাব এ রোগের অন্যতম লক্ষণ।

লিভার ক্যান্সার রোগীদের প্রায়ই জন্ডিস থাকে না, আর থাকলেও তা খুবই অল্প। রোগীদের খাওয়ায় অরুচি, অতিরিক্ত গ্যাস কিংবা কষা পায়খানার উপসর্গ থাকতে পারে-আবার কখনো দেখা দেয় ডায়রিয়া। পেটে পানি থাকতেও পারে, আবার না-ও থাকতে পারে।

লিভার ক্যান্সার নির্ণয়

লিভার ক্যান্সার নির্ণয়ে সহজ উপায় একটি নির্ভরযোগ্য আল্ট্রাসনোগ্রাম। তবে কখনো কখনো সিটি-স্ক্যানেরও দরকার পড়ে। রক্তের AFP পরীক্ষাটি লিভার ক্যান্সারের একটি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য টিউমার মার্কার। লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত যে কোন ব্যক্তিরই উচিত প্রতি ৬ মাসে একবার AFP ও আল্ট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষা করা। তবে লিভার ক্যান্সারের ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে হলে আল্ট্রাসনোগ্রাম গাইডেড FNAC অত্যন্ত জরুরি আর অভিজ্ঞ হাতের সাফল্যের হারও প্রায় শতভাগ।

লিভার ক্যান্সারে নতুন আশা

শুরুতেই যেমনটি বলেছি লিভার ক্যান্সারে আশার এখন শেষ নয়, বরং শুরু। শুরুতে ধরা পড়লে আর আকারে ছোট থাকলে অপারেশনের মাধ্যমে এই টিউমার লিভার থেকে কেটে বাদ দেওয়া যায়। আর এর জন্য প্রয়োজনীয় কুসা মেশিন ও দক্ষ হেপাটোবিলিয়ারি সার্জন এদেশেই বর্তমান। পাশাপাশি আছে বিনা অপারেশনে টিউমার অ্যাবলেশন বা টিউমারকে পুড়িয়ে দেয়া। নামমাত্র খরচে আল্ট্রাসনোগ্রাম গাইডে আমাদের দেশে এখন অহরহই লিভার ক্যান্সারের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন আমরা করছি। পাশাপাশি গরিব রোগীদের জন্য আল্ট্রাসনোগ্রাম গাইডে সস্তায় অ্যালকোহল দিয়েও অ্যাবলেশন বা টিউমার পুড়িয়ে ছোট করে দেওয়া সম্ভব। আছে আরও কিছু আশা। যেমন এসেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর, কিন্তু অনেক কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কেমোথেরাপি জেলোডা ও সুরাফিনেব। এই দুটি ওষুধই আমাদের দেশে তৈরিও হচ্ছে। আর এসব দিয়ে আমরা লিভার ক্যান্সারের রোগীদের চিকিৎসা এদেশে নিয়মিতই করছি। আর তাই লিভারের ক্যান্সারে শেষ হয়নি আশা।

ফ্যাটি লিভার
লিভারে চর্বি রোগ

ডাঃ বিমল চন্দ্র শীল
এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন)
এমডি (গ্যাস্ট্রো), মেম্বার-আইএসজি (ইন্ডিয়া)
ফেলো ইন্টারভেনশনাল গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি (AIIMS, Delhi)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, পরিপাকতন্ত্র ও লিভার বিশেষজ্ঞ
সহযোগী অধ্যাপক, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগ
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
চেম্বার ঃ ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা।

ফ্যাটি লিভার কী?
সাম্প্রতিককালে ফ্যাটি লিভার নামক একটি রোগের প্রাদুর্ভাব প্রায়ই লক্ষণীয়। লিভার বা যকৃতের কোষসমূহে অতিরিক্ত চর্বি জমার কারণেই উক্ত রোগ দেখা দেয়।

কত প্রকার?
১। অ্যালকোহলিক (মদ্যপানজনিত) ফ্যাটি লিভার রোগ (AFLD)
২। নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার রোগ (NAFLD)
(মদ্যপানজনিত নয় এমন কারণে ফ্যাটি লিভার রোগ) যেহেতু এই রোগটিই আমাদের দেশে বেশি দেখা যায়। এই প্রবন্ধে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার রোগটি আলোকপাত করা হলো।

লিভারে চর্বি জমার কারণসমূহ কী?
১। শরীরের অতিরিক্ত ওজন (Obesity)
২। রক্তে চর্বির আধিক্য (Dysilipidemia)
৩। ডায়াবেটিস
৪। ইনসুলিন কার্যকরহীনতা (Insulin Resistance)
কায়িক পরিশ্রম বা ব্যায়ামবিহীন আরামপ্রদ জীবনযাপন (Sedentary Life Styles) এবং অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস উপরোক্ত অবস্থাসমূহের প্রধান কারণ।

লিভারে চর্বির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ
- মদ্যপান
- হেপাটাইটিস সি
- উইল্‌সন ডিজিজ (Wilson's disease)
- অনেক দিন ধরে উপবাস
- হরমোনজনিত রোগ– হাইপোথাইরয়েডিজম, হাইপোপিটুইটারিজম।
- কিছু ওষুধ যেমন– এমিয়োডেরন, স্টেরয়েড, মেথোট্রেক্সেট, টেমোক্সিফেন, ভেলপ্রোয়েট ইত্যাদি।

এ রোগটির ব্যাপ্তি কেমন?
বিভিন্ন গবেষণাপত্রে রোগটির ব্যাপকতা দেখানো হয়েছে।

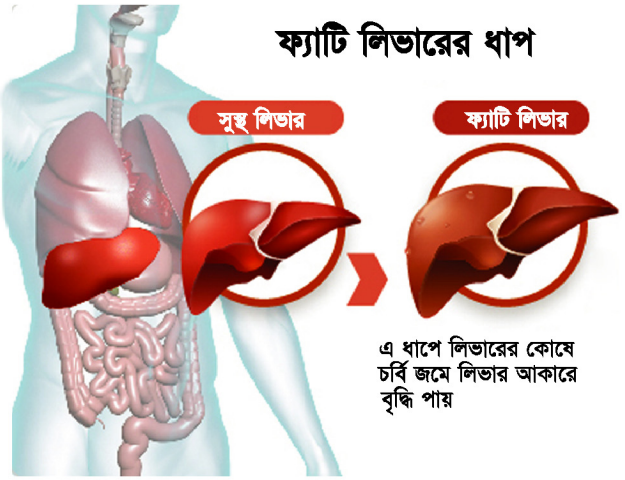

একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলো–
স্থূল দেহ (বি.এম.আই > ৩০)-৯৪% লোক রোগাক্রান্ত।
অতিরিক্ত ওজন (বি.এম.আই > ২৫)- ৬৭% লোক রোগাক্রান্ত।
স্বাভাবিক ওজন- ২৫% লোক রোগাক্রান্ত
ডায়াবেটিক রোগী-৪০-৭০% লোক রোগাক্রান্ত।

$$(\text{বি.এম.আই}) = \frac{\text{শরীরের ওজন (কেজি)}}{\text{উচ্চতা (মিটার)}^2}$$

আমাদের দেশে সাধারণ হিসেবে শতকরা ১৮ থেকে ২০ ভাগ মানুষ উক্তরোগে ভুগছেন।

রোগটি কীভাবে অগ্রসর হয়?
লিভারে চর্বি > কোষসমূহে চর্বিজনিত প্রদাহ > ক্রমবর্ধমান লিভারে ফাইব্রোসিস > লিভার সিরোসিস > লিভার ক্যান্সার

ফ্যাটি লিভার রোগের জটিলতা কি হতে পারে?

১। লিভার সিরোসিস

২। লিভার ক্যান্সার

৩। হৃদরোগজনিত ঝুঁকি বৃদ্ধি।

রোগটির লক্ষণগুলো কী কী?

ক) বেশির ভাগ রোগীই লক্ষণহীন থাকেন এবং সাধারণত ঘটনাক্রমেরোগটি নির্ণীত হয়। লিভার ফাংশন টেস্টে অস্বাভাবিকতা বা লিভার সাইজ বড় হওয়া বা অন্য রোগের জন্য পরীক্ষা করার সময়ে বিশেষত আলট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে রোগটি ধরা পড়ে।

খ) কারো কারো পেটের ডান উপরি অংশে একটু ভার ভার বা হালকা ব্যথা অনুভূত হতে পারে। কেউ বা শারীরিক দুর্বলতার অভিযোগ করে থাকেন।

গ) কখনো কখনো রোগী ফ্যাটি লিভার রোগের জটিলতা নিয়ে আসতে পারেন (যেমন লিভার সিরোসিস ও তার জটিলতা সমূহ, লিভার ক্যান্সার ইত্যাদি।)

চিকিৎসা

ফ্যাটি লিভার রোগের চিকিৎসার দুটি দিক–

১. লিভার রোগের চিকিৎসা

২. রোগটির সন্নিহিত অবস্থাগুলো নির্ণয় ও চিকিৎসা, যেমন- শরীরের স্থূলতা, রক্তে চর্বির আধিক্য, ডায়াবেটিস, ইনসুলিন অকার্যকরতা, কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকিসমূহ ইত্যাদি।

কী করণীয়?

- বর্তমানে ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসা প্রধানত জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তনের ওপরই জোর দিয়ে থাকে। শরীরের ওজন কমানো, দৈনন্দিন ব্যায়াম এবং কম ক্যালরিযুক্ত আঁশসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।
- শরীরের ওজন স্বাভাবিক রাখতে সচেষ্ট হতে হবে। অতিরিক্ত ওজন ঝেড়ে ফেলুন। শরীরের ৫-১০% ওজন কমালে লিভারের চর্বি ও চর্বিজনিত প্রদাহ যথেষ্ট পরিমাণে কমে এবং লিভারের এনজাইমগুলো স্বাভাবিক হয়। তবে মনে রাখতে হবে অতি দ্রুত শরীরের ওজন কমানো ঠিক নয়।
- সুষম কম ক্যালরিযুক্ত আঁশসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করুন। যেমন- সবুজ শাকসবজি, ফলমূল, ইত্যাদি। উচ্চ শর্করা বা চর্বিসমৃদ্ধ খাবার যেমন-ঘি, মাখন, পনির, লাল মাংশ, মাছের ডিম, বড় মাছের মাথা বর্জনীয়। এতে শরীরের পরিপাক সঠিক হয় এবং ওজন ঠিক রাখতে সহায়তা করে।
- সর্বোতভাবে নেশাজাতীয় দ্রব্য বর্জন করতে হবে। মদ্যপান ত্যাগ করুন।
- ফাস্টফুড, কার্বোনেটেড চর্বি বা শর্করা সমৃদ্ধ ড্রিংকস, চকলেট বর্জনীয়।
- দৈনিক শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম শরীরের ওজন ও লিভারের চর্বি কমাতে সাহায্য করে।
- রোজ ঘণ্টা খানেক ঘাম ঝরিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করুন।
- ডায়াবেটিস অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসায় কী ওষুধ ব্যবহার করা হয়?

বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে যে কোন ওষুধই জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তনের চেয়ে অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যায়াম, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের বেশি কার্যকর নয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ওষুধ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমেব্যবহার করা হয় যেমন- ভিটামিন-ই, ওমেগো-৩ ফ্যাটি এসিড ইত্যাদি। রক্তে চর্বির আধিক্য কমাতে স্টাটিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

উপসংহার

ফ্যাটি লিভারে রোগ হলে আতংকিত হবার কিছু নেই। খুব কম সংখ্যক রোগীরই জটিলতা তৈরি হয় এবং তা হতে অনেক বছর সময় লাগে। তাই ভালো থাকার জন্য শরীরের ওজন স্বাভাবিক রাখুন। উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার বর্জন করুন। দৈনন্দিন ব্যায়ামের অভ্যাস করুন, রোগমুক্তি আসবেই আসবে।

ফ্যাটি লিভার রোগীর কী কী পরীক্ষা করা প্রয়োজন?

১। **রক্ত পরীক্ষা :** কোন নির্দিষ্ট একটি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটি নির্ণয় করা যায় না। কিছু লিভার এনজাইম যেমন- ALT, AST, ALP, GGT মাত্রা বাড়তে পারে। এক্ষেত্রে ALT এনজাইম, AST এর তুলনায় বাড়তি থাকবে, যা অ্যালকোহলিক লিভার রোগের বিপরীত। সন্নিহিত কিছু রক্ত পরীক্ষা যেমন Viral Marker- HBsAg, Anti HCV, রক্তে চর্বির মাত্রা, রক্তে গ্লুকোজমাত্রা, থাইরয়েড হরমোন ইত্যাদি পরীক্ষা দেখে নেওয়া উচিত।

২। **আলট্রাসনোগ্রাফি :** এটি ফ্যাটি লিভার নির্ণয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

৩। **সিটি স্ক্যান বা এমআরআই :** উক্ত পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমেও ফ্যাটি লিভার নির্ণয় করা যায়।

৪। **ফাইব্রোস্ক্যান লিভার :** উক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে লিভারের নমনীয়তা দেখা হয় এবং লিভার কোষের চর্বি জমার আপাত পরিমান নির্ণয় করা যায়। উক্ত পরীক্ষা দ্বারা রোগটির ক্রম অগ্রসরমানতা চেক করা যায়।

৫। **লিভার বায়োপসি :** এ পরীক্ষাটি গোল্ড স্টান্ডার্ড, যার মাধ্যমে লিভার কোষসমূহে চর্বি, চর্বিজনিত প্রদাহ ও ফাইব্রোসিস ব্যাপ্তি দেখা যায়। কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে পরীক্ষাটির প্রয়োজন হয়।

স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শে ২৪ ঘণ্টা আপনার পাশে

আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শের জন্য
যে কোন মোবাইল থেকে ডায়াল করুন

10606

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ
- ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট
- স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য
- অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
- হোম সার্ভিস*

* *প্যাথলজির জন্য নমুনা সংগ্রহ, ব্লাড প্রেসার ও ওজন পরীক্ষা, ইসিজি*

ল্যাবএইড গ্রুপ, বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫
ফোন : ৫৮৬১০৭৯৩-৮, ৯৬৭০২১০-৩

ল্যাবএইড
কল সেন্টার
প্রতি মুহূর্তের স্বাস্থ্য সমাধান

পিত্তথলির থলের কথা

ডাঃ মোঃ সায়েফউল্লাহ
এফসিপিএস (সার্জারি)
জেনারেল, লেপারোস্কোপিক ও কোলোরেকটাল সার্জন
সহকারী অধ্যাপক
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল
চেম্বারঃ ল্যাবএইড লিমিটেড, ঢাকা।

কথিত আছে, সার্জনদের ব্রেড অ্যান্ড বাটার হচ্ছে পিত্তথলি। প্রতিদিনের অপারেশন তালিকার শুরুতে এক বা একাধিক রোগির পিত্তথলিতে অপারেশন থাকবেই। পিত্তরসের ভিন্ন ভিন্ন ধরণ, বিভিন্ন জীবাণুর সংক্রমণ, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার, রক্তকোষ ভেঙে যাওয়ার মতো রোগের কারণে সাধারণত পিত্তথলিতে পাথর হয়।

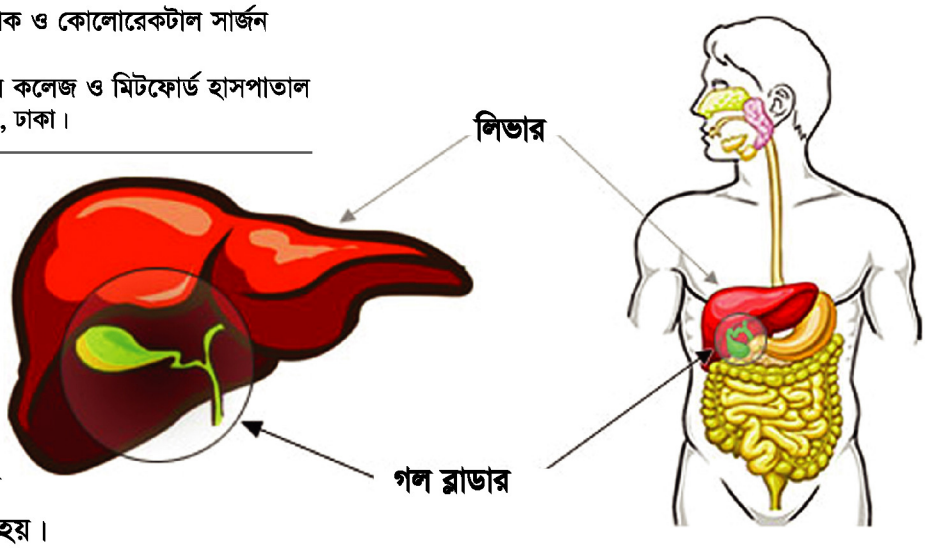

পিত্তথলির সর্বাধিক রোগগুলো কী?

পিত্ত পাথর, পিত্ত ক্যান্সার, পিত্ত সংক্রমণ (পাথর দিয়ে অথবা পাথর বিহীন) এছাড়া পিত্ত পাথরের কারণে বিভিন্ন জটিলতাসমূহ।

কখন অপারেশন লাগবে?

মূলত উল্লেখ্য কারণগুলো থাকলেপিত্তথলি ফেলে দিতে কিংবা অপারেশনের প্রয়োজন হয়।

অপারেশনে ক্ষতি হবে কী?

স্বাভাবিক অবস্থায় পিত্তরস যকৃত থেকে তৈরি হয়ে পিত্তথলিতে জমা থাকে। পিত্তথলির কাজ এই রসকে কিছুটা ঘন করে রাখা। আমাদের আহারের পর পিত্তথলি এই রস নালি দিয়ে খাদ্যনালিতে পাঠিয়ে দেয়। পিত্তথলি না থাকলেও যকৃতে পিত্তরস ঠিকই তৈরি হয় এবং সব সময়ই একটু একটু করে খাদ্যনালিতে এসে খাবারের সাথে মিশে যায়। এ কারণেই পিত্তথলি না থাকলেও স্বাভাবিক জীবন যাপনে কোন সমস্যা হয় না।

অপারেশনের পর কোন ধরনের খাবার নিষিদ্ধ?

পিত্তরস লিভার থেকে তৈরি হয় এবং পিত্তনালি দিয়ে খাদ্যনালিতে খাবারের সংস্পর্শে আসে। তাই পিত্তথলি না থাকলেও কোন খাবারেই সমস্যা হয় না।

অপারেশনের উপযুক্ত সময় ও প্রক্রিয়া কি?

প্রদাহের তিন দিনের মধ্যে অন্যথায় তীব্র প্রদাহ যদি ৩ দিনের অধিক হয় তবে সাময়িক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে ৬ সপ্তাহ পর অপারেশন করা উত্তম। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় পেট ফুটো করে (লেপারোস্কপিক, কোলেসিস্টেকটোমি) ভর্তির দিনই অপারেশন করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগী বাড়ি চলে যেতে পারেন। অপারেশনের ৬ ঘণ্টা পর থেকে মুখে খাবার ও হাঁটা চলা করা যায় এবং দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম করা যায় বলেই এটি পিত্তথলির উত্তম (Gold Standard) অপারেশন পদ্ধতি।

অপারেশনের প্রয়োজন কতটা? (কখনও ব্যথা হয়নি)

অন্য কারণে পরীক্ষায় পাথর ধরা পড়লে, পিত্তথলির পাথর খুব বড় হলে, স্বল্প বয়সী ডায়াবেটিস রোগী হলে, অনেকগুলো ছোট পাথর থাকলে অপারেশন করাই উত্তম। অন্যথায় যে কোন জটিলতা দেখা দিতে পারে যেমন- জন্ডিস হওয়া, অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ অথবা পিত্তথলির ক্যান্সার।

অন্যান্য রোগে ও আক্রান্ত রোগীকে অপারেশন করা যায় কী?

অপারেশনে সাবধানতা অবলম্বন করে বিভিন্ন রোগের মাত্রাকে সহনশীল পর্যায়ে এনে অপারেশন করলে কোন সমস্যা হয় না।

রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা

পেটের ডানদিকের উপরিভাগে ব্যথা, পিঠের দিকে ডান পাশে ব্যাথা। সময়ে সময়ে ব্যথা ডান কাঁধে উপলব্ধি করা, পেট ফাঁপা, চর্বি জাতীয় খাবারে অস্বস্তি অনুভব হওয়া, জন্ডিস, জ্বর, বমিভাব, বমি হওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলো দেখা দেয়। অনেক সময় পিত্ত ক্যান্সার শুধু জন্ডিস ও উল্লেখ্য লক্ষণগুলো মৃদু আকারেও দেখা যায়। মনে রাখতে হবে, পিত্তথলির ক্যান্সার যখন ধরা পড়ে তখন অনেকাংশেই চিকিৎসার পরিধিকে ছাড়িয়ে যায় এবং কোনভাবেই ৬ মাসের অধিক রোগী বেঁচে থাকে না। তাই পিত্তথলির সমস্যায় সাবধানতার সাথে সুচিন্তিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেপারোসকপি করতে অসুবিধা হলে পেট কেটেই অপারেশন করতে হয়। অভিজ্ঞতার অভাব থাকলে পিত্তনালির ইনজুরিসহ নানাবিধ জটিলতাসহ তখন জীবন সংকটাপন্নও হয়ে উঠতে পারে। তাই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে সঠিক চিকিৎসা নিন।

নবজাতকের জন্ডিস!

ডাঃ কাজী মোঃ কামরুল হাসান
এমবিবিএস, ডিসিএইচ (শিশু স্বাস্থ্য)
নবজাতক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ
কনসালটেন্ট, নিওনেটোলজি ও শিশুরোগ বিভাগ
চেম্বারঃ ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে শহীদ-নাদিয়া দম্পতির। হাসপাতালে এনআইসিইউতে ভর্তি করতে হয়েছে চার দিন বয়সী সোনামণিকে। ডাক্তার বলেছেন ওর শরীরের রক্ত বদলানো দরকার। ও নেগেটিভ রক্ত জোগাড় করতে বলেছেন এক ব্যাগ। বুকের মধ্যে শূন্য হয়ে গেছে শহীদ আর নাদিয়ার। এতটুকু সোনামণির শরীর থেকে রক্ত বের করে আবার রক্ত ঢুকানো।

অথচ সবই ঠিক চলছিল। নাদিয়ার রক্তের গ্রুপ 'ও পজেটিভ'। বাবুর এ পজেটিভ। সুন্দর সবল স্বাস্থ্যবান হয়েছিল তাদের সোনামণিটা। তৃতীয় দিনে অনেকটা ডাক্তারের কথা অমান্য করেই বাসায় চলে যান নাদিয়া খাতুন সোনামণিকে নিয়ে। যাবার আগে ডাক্তাররা রক্তের অনেকগুলো পরীক্ষাও করিয়ে ছিলেন। বলেছিলেন, বাচ্চার রক্তে বিলিরুবিন বেশি আছে। চিকিৎসা দরকার। শহীদের মা রাজি হয়নি। উনি বলেছেন ডাক্তাররা ওরকম বলবেনই। বাসায় গিয়ে সকালে রৌদ্রে রাখর। ঠিক হয়ে যাবে সব।

বাসায় যাবার পর আরো বেশি হলুদ মনে হচ্ছিল বাবুকে। চতুর্থ দিনে অনেক বেশি হলুদ হয়ে গেলে নাদিয়ার বাবা একজন পরিচিত ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন। উনি দেখেই বললেন, 'কি সর্বনাশ! এখনো হাসপাতালে নেন নাই?' তারপরই ল্যাবএইড হাসপাতালে আসা। জন্ডিসের পরীক্ষা করা হলো। ডাক্তার বলেছেন, বাবুর রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ তিরিশ এবং বলেছেন শুধু ফটোথেরাপি বা লাইট দিয়ে চিকিৎসা নয়, রক্ত বদলানো লাগবে।

সাধারণত নবজাতকের জন্ডিস যে জন্য হয়

ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস

- ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস ২-৩ দিনে এসে আবার ৭-১০ দিনে মিলিয়ে যায়। আর রক্তে জন্ডিসের মাত্রা ১০-১২ মিলিগ্রামের বেশি হয় না। অবশ্য যদি শরীরে রক্তপাত হয়, তা হলে জন্ডিসের মাত্রা বাড়তে পারে
- দ্রুত রক্ত কোষ ভেঙ্গে গেলে জন্ডিস প্রথম ২৪ ঘণ্টায় হতে পারে
- Rh মিস ম্যাচিং ABO ইনকমপিটিবিলিটি G-6-P-D অপ্রতুলতা, রক্তকোষের অস্বাভাবিকত্ব।
- নবজাতকের শরীরের সংক্রমণ, কোথাও রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া- হেমাটমা

বেশিদিন স্থায়ী জন্ডিস

- থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা, সংক্রমণজনিত সমস্যা
- এছাড়া লিভারের সমস্যায় দীর্ঘমেয়াদি জন্ডিস হতে পারে
- অনেক সময় বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্যও জন্ডিস একটু দীর্ঘ মেয়াদি হয়

এছাড়াও কিছু জন্ডিস আছে যা কনজুগেটেড জন্ডিস বলা হয় এবং যা কিছু জন্মগত অসুখের লক্ষণ- সিসটিক ফাইব্রোসিস, গ্যালাকটোসোমিয় ইত্যাদি।

কেন জন্ডিস হয়?

নবজাতকের রক্তের কোষ দ্রুত ভাঙতে থাকে, যা লিভার সমানতালে অপসারণ করতে পারে না। ফলে রক্তে বিলিরুবিন নামক পদার্থটি বাড়তে থাকে। বিশেষ করে মায়ের রক্ত Rh Negative হলে এবং বাচ্চার Rh Positive হলে এই জন্ডিস খুব দ্রুত বাড়তে থাকে। কারণ মায়ের শরীরের এন্টিবডি শিশুর রক্তের কোষগুলি খুব গ্রুপ ভেঙে দেয়। A, B, O গ্রুপের মাঝেও এটা দেখা দিতে পারে। মায়ের O গ্রুপ আর বাচ্চার A অথবা B হলেও এটা হতে পারে।

জন্মের পর প্রায় ৬০ ভাগ বাচ্চা যারা সময়মত জন্ম নেয় তাদের জন্ডিস হতে পারে। আর ৮০ ভাগ সময়ের আগেই জন্মানো বাচ্চার জন্ডিস দেখা দেয়। এছাড়া আরো অনেক কারণ আছে জন্ডিসের। সেপসিস হলে হতে পারে, বাচ্চা প্রিম্যাচিউর হলে হতে পারে। হতে পারে রক্তকোষের অস্বাভাবিকত্বের কারণেও।

কোন নবজাতক বিপদের সম্মুখীন?

- যাদের জন্মের সময় ওজন কম। যারা প্রিম্যাচিউর বেবি
- আগেও যদি একই পরিবারের কোন শিশুর জন্ডিসের ঘটনা থাকে
- জন্ডিস যদি প্রথম ২৪ ঘণ্টায়ই দেখা যায়
- বুকের দুধ পান করা শিশু
- মায়ের ডায়াবেটিস থাকলে

কী রকম জন্ডিস হয়?

সাধারণত জন্মের পর প্রথম ২৪ ঘণ্টায় জন্ডিস হলে তা নিশ্চিত গুরুতর কিছু। জন্মের দুই থেকে তিন তিনের মাথায় যে জন্ডিস দেখা দেয় এবং সাত-আট দিনে ভালো হয়ে যায়, তাকে ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস বা স্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়া হয়।

চিকিৎসা কখন দিতে হয়?

জন্মের পর দুই-তিন দিনের মাথায় জন্ডিস দেখা দিলে ডাক্তাররা রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দেন। যদি বিপৎসীমার কাছাকাছি থাকে তাহলে দ্রুত ফটোথেরাপি প্রয়োগ করলে ৪৮-৭২ ঘণ্টার মধ্যেই জন্ডিস কমে যায়। কিন্তু চিকিৎসা না নিলে জন্ডিস বেড়ে যেতে পারে এবং অনেক সময় খুব দ্রুত বেড়ে যেতে পারে। মা ও শিশুর দুজনেই পজেটিভ ব্লাড গ্রুপের হলেও 'ও' এবং 'এ' বা 'বি' গ্রুপের মাঝেও বিলিরুবিন অনেক বেড়ে যেতে পারে। Rh Negative মা হলে আর পজেটিভ বাচ্চার ক্ষেত্রে তা আরও দ্রুত হয়।

রক্ত পরীক্ষা

সাধারণত রক্তের বিলিরুবিন পরীক্ষাই যথেষ্ট। কিন্তু কোন অস্বাভাবিকত্ব সন্দেহ হলে আরো বেশি পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়।

বাচ্চার ও মায়ের রক্তের গ্রুপ, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট, ডাইরেক্ট কুমব্‌স টেস্ট, টর্চ স্ক্রিনিংসহ নানা পরীক্ষা করা হয় জন্ডিসের কারণ নির্ণয় করার জন্য।

চিকিৎসা

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা দিতে সক্ষম যে কোন হাসপাতালেই জন্ডিসের চিকিৎসা দেয়া সম্ভব। ফটোথেরাপি খুব কার্যকর চিকিৎসা। নীল আলোর ফটোথেরাপি, বিলি ব্লাংকেট, লেড ফটোথেরাপি আজকাল ব্যবহৃত হয়।

তবে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে গেলে প্রয়োজন রক্ত বদল। নবজাতকদের জন্য নিবিড় চিকিৎসা (NICU) ব্যবস্থা আছে এমন হাসপাতালে এরকম চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে নাভির শিরাপথে বাচ্চার শরীরের রক্তের দ্বিগুণ পরিমাণ রক্ত দিয়ে এই চিকিৎসা করা হয়। সাথে থাকে ফটোথেরাপি। মনে রাখা দরকার রক্তে বিলিরুবিন খুব বেশি বেড়ে গেলে তা মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় এবং স্থায়ীভাবে মস্তিষ্কের ক্ষতি করে, যা এক ভয়াবহ অভিশাপ।

হেপাটাইটিস 'বি' কে ভয় নয়

ডাঃ মোঃ নওশাদ আলী
এমবিবিএস (ডিএমসি), এফসিপিএস (মেডিসিন)
এমডি (গ্যাস্ট্রোএনটেরোলজি)
মেডিসিন, পরিপাকতন্ত্র ও লিভার বিশেষজ্ঞ
সহকারী অধ্যাপক, গ্যাস্ট্রোএনটেরোলজি বিভাগ
রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
চেম্বারঃ ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিক), রংপুর।

হেপটাইটিস বি একটি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর সংক্রমণ ভালো হয়ে যায়। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের সংক্রমণে যকৃতের কার্যক্ষমতা হ্রাস, যকৃতের ক্যান্সার অথবা সিরোসিসও হতে পারে। রক্ত, বীর্য অথবা শরীরের অন্যান্য তরল পদার্থের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। বড়দের ক্ষেত্রে এর সংক্রমণ ভালো হয়ে গেলেও শিশুদের ক্ষেত্রে এর সংক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

হেপাটাইটিস বি- এর লক্ষণ

অনেক ক্ষেত্রেই প্রথমদিকে কোন ধরণের উপসর্গ দেখা যায় না। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের দুই থেকে তিন মাস পর এর লক্ষণ ও উপসর্গগুলো প্রকট হয়। হেপাটাইটিস বি-এর লক্ষণ ও উপসর্গগুলো হাল্কা থেকে মারাত্মক হয়ে থাকে।

- শরীরের চামড়া ও চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া
- গাঢ় রঙয়ের প্রস্রাব হওয়া
- ক্ষুধামান্দ্য
- ক্লান্ত এবং অবসাদ অনুভব করা
- পেটব্যথা
- দীর্ঘ দিন ধরে জ্বর

মারাত্মক ক্ষেত্রে - রোগী অজ্ঞান হওয়া, এলোমেলো কথাবলা, খিঁচুনি হওয়া যাকে হেপাটিক এনকেপালোপ্যাথি বলে।
এই সব রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা মাত্র ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কী ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে?

শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা
যেমন – লিভার এনজাইম -ALT (SGPT),
HBsAg – এটা ভাইরাসের বহিরাবরণ বা তাঁর খোসা মাত্র -যা ভাইরাসের নিষ্ক্রিয় অংশ
HBeAg – ভাইরাসের সক্রিয় অংশ
HBV-DNA – ভাইরাসের প্রাণ

কী ধরণের চিকিৎসা আছে?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস বি -এর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কিছু সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কার চিকিৎসার প্রয়োজন তা নির্নয় করেন।
বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে - জীবাণুনাশক ওষুধ সেবন যেমন - অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ (ট্যাবলেট ও ইনজেকশন) মারাত্মক ক্ষেত্রে - যকৃত প্রতিস্থাপন।

শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ

হেপাটাইটিস-বি তে নবজাতকরা পিতামাতার মাধ্যমে আক্রান্ত হতে পারে। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস জন্মের সময় বাহক মা থেকে শিশুর মধ্যে সংক্রমিত হয়। এ ধরনের সংক্রমণকে 'ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন' বলা হয়। এছাড়া শৈশবে ও কৈশোরে খেলাধুলার সময় আঁচড়ের মাধ্যমে বাহক শিশু থেকে সুস্থ শিশুতে এ রোগ ছড়াতে পারে। একইভাবে সুচের মাধ্যমে নাক ও কান ফুটো করার মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে। আবার অশোধিত সিরিঞ্জ ও সুঁচ দ্বারা এবং চুল কাটার সময়ও সংক্রমণ ঘটতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে 'ইপিআই ভ্যাকসিন সিডিউল' অনুযায়ী ৩ ডোজ হেপাটাইটিস-বি টিকা দিলে এটি শিশুকে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস থেকে রক্ষা করবে।

আক্রান্ত হবার পর জীবনযাপন পদ্ধতি

- নিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক বজায় রাখা।
- অন্যের ব্যবহৃত সুঁচ/সিরিঞ্জ ব্যবহার না করা এবং নিজের ব্যবহৃতটাও অন্যকে ব্যবহার করতে না দেয়া
- আক্রান্ত ব্যক্তি অন্যকে রক্ত অথবা অন্য কোন অঙ্গ দান করা থেকে বিরত থাকা
- রেজার, ব্লেড এবং দাঁত মাজার ব্রাশ অন্যের সাথে আদান- প্রদান না করা
- গর্ভবতী মহিলা যদি হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে দ্রুত চিকিৎসককে জানাতে হবে যাতে গর্ভের শিশুর কোন ক্ষতি না হয়।

হেপাটাইটিস বি প্রতিরোধের উপায়

কতগুলো বিষয়ে সতর্ক থাকলে এ রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব-

- সেলুনে চুল, দাড়ি কাটার সময় আলাদা (Separate and disposable) ব্লেড ব্যবহার করা
- ইনজেকশন নেবার সময় ডিস্পোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।
- হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা অথবা নিরাপদ শারীরিক পদ্ধতি অবলম্বন করা।
- শিরাপথে মাদক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা
- শরীরে ছিদ্র বা উলকি আঁকার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা
- চিকিৎসক ও নার্সরা হেপাটাইটিস-বি রোগী চিকিৎসার সময় বাড়তি নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।
- যথাসময়ে হেপাটাইটিস-বি প্রতিষেধক টিকা নেওয়া।

হেপাটাইটিস 'সি' সচেতনতা

ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
এমবিবিএস (ঢাকা), এমডি (হেপাটোলজি)
লিভার বিশেষজ্ঞ
সহকারী অধ্যাপক, হেপাটোলজি
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
চেম্বারঃ ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিক) চট্টগ্রাম।

হেপাটাইটিস ভাইরাসগুলোর মধ্যে হেপাটাইটিস সি সবচেয়ে মারাত্মক। সাধারণত দূষিত রক্তের মাধ্যমে এবং বিশেষ করে একই সুঁচ দিয়ে মাদক সেবনসহ নানাভাবে হেপাটাইটিস সি ছড়াতে পারে। এটি একটি সংক্রামক রোগ। বড়-ছোট সবারই এই রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি আছে।

হেপাটাইটিস সি রোগের লক্ষণ

প্রথম দিকে হেপাটাইটিস 'সি'র কোন লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা যায় না। সত্যিকার অর্থে লক্ষণ ও উপসর্গগুলো মৃদু বা হাল্কা এবং অনেকটা সাধারণ সর্দি কাশি-জ্বর বা ফ্লুর মতো হয়ে থাকে। সাধারণত যেসব লক্ষণ ও উপসর্গগুলো দেখা দিতে পারে-

- অবসাদ
- জ্বর জ্বর ভাব
- ক্ষুধামান্দ্য ও বমি বমি ভাব
- মাংসপেশি এবং অস্থিসন্ধিতে সামান্য ব্যথা
- এসব লক্ষন ও উপসর্গ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে

প্রাথমিক ভাবে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে শরীরে এই ভাইরাসের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। পরবর্তী সময়ে আলট্রাসনোগ্রাফি, ফাইব্রোস্ক্যান এবং প্রয়োজনে লিভার বায়োপসির (Liver Biopsy) মাধ্যমে যকৃতের টিস্যু পরীক্ষা করতে হতে পারে।

হেপাটাইটিস সি হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন যারা

- স্বাস্থ্য কর্মী যিনি সংক্রমিত রক্তের সংস্পর্শে এসেছেন
- জীবাণুমুক্ত নয় এমন যন্ত্রপাতি দিয়ে যাদের শরীরে কোন অপারেশন হয়েছে
- জীবাণুমুক্ত নয় এমন যন্ত্রপাতি দিয়ে যারা দাঁতের চিকিৎসা করিয়েছেন
- নানা প্রয়োজনে যাদের শরীরে রক্ত গ্রহণ প্রয়োজন হয়
- যারা সুঁচের মাধ্যমে মাদক সেবনে অভ্যস্ত
- যাদের এইচআইভি ভাইরাস রয়েছে
- অপরিষ্কার বা জীবাণুমুক্ত নয় এমন যন্ত্রপাতি দিয়ে উল্কি আঁকা
- হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া শিশু যারা দীর্ঘদিন যাবৎ হেমোডায়ালাইসিস (Hemodialysis) চিকিৎসা গ্রহণ করছে

এ রোগের চিকিৎসা

লিভার বিশেষজ্ঞের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে এ রোগের চিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিয়মিত রক্ত এবং অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনিই চিকিৎসার ধরণ, ওষুধের মাত্রা ও স্থায়িত্ব নির্ধারণ করবেন। সি-ভাইরাসের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর এবং ব্যয়বহুল ইনজেকশন পেগইনটারফেরন ও রিবাভাইরিন জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ওষুধ এখন আমাদের দেশেও তৈরি হচ্ছে। সুখের খবর, এ রোগের জন্য ইনজেকশনের পরিবর্তে মুখে খাবার ওষুধও ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা বাংলাদেশেও তৈরি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। রোগের কোন কোন পর্যায়ে এন্টিভাইরাল ওষুধসমূহ ব্যবহার অযোগ্য হতে পারে এবং কখনও কখনও লিভার ট্রান্সপ্লান্ট বা যকৃত প্রতিস্থাপন করতে হতে পারে।

প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়

- যে সমস্ত ওষুধ যকৃতের ক্ষতি করে সেগুলো বাদ দিতে হবে
- সুষম খাবার গ্রহণ এবং নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হতে হবে
- নিজের ব্যবহৃত টুথব্রাশ ও রেজার আলাদা রাখা
- মদ্যপান থেকে বিরত থাকা
- নিরাপদ শারীরিক সম্পর্কের অভ্যাস গড়তে হবে
- শিরাপথে মাদক সেবন এবং অন্যের ব্যবহৃত সুঁচ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে
- শরীর ছিদ্র করা অথবা উল্কি আঁকার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

ইআরসিপির যত কথা

ডাঃ মোঃ শাহেদ আশরাফ
এমবিবিএস (সিইউ), বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এমডি হেপাটোলজি/লিভার রোগ (বিএসএমএমইউ)
মেডিসিন, লিভার ও পরিপাকতন্ত্র বিশেষজ্ঞ
সহকারী অধ্যাপক, লিভার বিভাগ
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা।
চেম্বারঃ ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিক), মিরপুর।

ইআরসিপি (ERCP) একটি বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি যা দুটি বিশেষ কাজকে সমন্বয় সাধন করে থাকে। প্রথম কাজ হলো পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগ যথা ইসোফেগাস, পাকস্থলি, ডিওডেনাম ক্যামেরার সাহায্যে স্বচক্ষে অবলোকন করা এবং এক্সরের মাধ্যমে সাধারণ পিত্তনালি ও অগ্ন্যাশয়নালীর রোগসমূহ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা। ইআরসিপি সম্পর্কে দক্ষ হয়ে উঠতে হলে শরীর বিদ্যার তত্ত্বীয় জ্ঞানের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ লিভার, পিত্তথলি, পিত্তনালি, অগ্ন্যাশয়, অগ্ন্যাশয়নালি, ক্ষুদ্রান্ত্র (ডিওডেনাম)- এর সম্পর্ক এবং অবস্থান পরিষ্কার হওয়া দরকার।

যকৃত পিত্তরস তৈরি করে। এই যকৃত থেকে ডান যকৃতনালি (Right Hepatic Duct) ও বাম যকৃতনালি (Left Hepatic Duct) বের হয়। উক্ত নালি দুটি কিছু দূর যাবার পর একত্রিত হয়ে সাধারণ যকৃত নালি (Common Hepatic Duct) তৈরি করে। এ দিকে পিত্তথলি থেকে একটি নালি বের হয়ে সাধারণ যকৃতনালির সাথে যুক্ত হয়ে সাধারণ পিত্তনালিতে (Common Bile Duct) পরিণত হয়।

লিভার থেকে তৈরিকৃত পিত্তরস সাধারণ যকৃতনালি হয়ে পিত্তথলিতে অবস্থান করে এবং আরও ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে অগ্ন্যাশয় থেকে প্রধান অগ্ন্যাশয়নালী (MPD) বের হয়ে আসে। উক্ত প্রধান অগ্নাশয় নালি এবং সাধারণ পিত্তনালীত ক্ষুদ্রান্ত্র (ডিওডেনাম) এর দ্বিতীয় অংশে প্রবেশ করে এবং একত্রিত হয়। শরীর খাদ্য গ্রহণ করার পর বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতার ফলে পিত্তথলি থেকে ঘন পিত্ত সাধারণ পিত্তনালি দিয়ে ডিওডেনাম এর দ্বিতীয় পর্বে এসে উন্মুক্ত হয় এবং চর্বি জাতীয় খাবার পরিপাক করে। অগ্নাশয় থেকে তৈরি হওয়া বিভিন্ন এনজাইম প্রধান অগ্ন্যাশয়নালি দিয়ে ডিওডেনামের দ্বিতীয় অংশে উন্মুক্ত হয়ে প্রোটিন জাতীয় খাবার পরিপাক করে।

উল্লেখ্য যে ইআরসিপি তখনই ব্যবহার করা হয় যখন রোগীর পিত্ত ও অগ্ন্যাশয়নালি সংকুচিত হয় বা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ইআরসিপি পূর্বে রোগনির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে শুধুমাত্র চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ইআরসিপির প্রধান কার্যকারিতা

রোগ নির্ণয়মূলক

১। পিত্তপাথর ২। পিত্তনালির টিউমার ৩। পিত্তনালির আঘাত

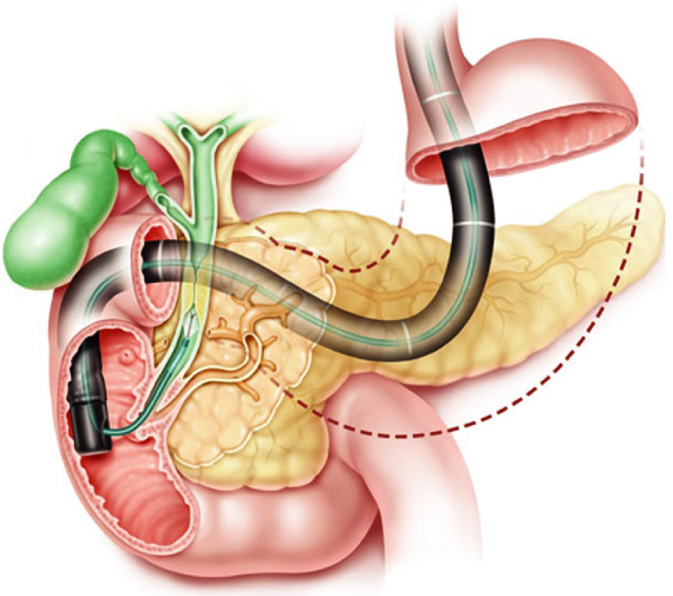

চিকিৎসামূলক

১। পিত্তনালির পাথর অপারেশন
২। নিরাময়মূলক স্টেন্ট প্রয়োগ
৩। সংকুচিত পিত্তনালি ও অগ্ন্যাশয়নালি প্রসারিত করা।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেই ইআরসিপি করা হয় না

১। সদ্য অগ্ন্যাশয় সংক্রমণ (Acute Pancreatitis)
২। রক্ত জমাটজনিত অসুস্থতা (Coagulation Disorder)
৩। সদ্য হার্ট অ্যাটাক
৪। রঞ্জক প্রতিক্রিয়াশীলতা
৫। দুর্বল স্বাস্থ্য
৬। তীব্র হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসজনিত রোগ।

ইআরসিপি-এর ঝুঁকি

১। ইআরসিপির প্রধান ঝুঁকি হল তীব্র অগ্ন্যাশয় সংক্রমণ (Acute Pancreatitis)
২। যে কোন প্রকার সংক্রমণ (Infection)
৩। এলার্জিক প্রতিক্রিয়াশীলতা (রঞ্জক)
৪। অধিক রক্তপাত
৫। পরিপাকতন্ত্রের ছিদ্রকরণ (Perforation)।

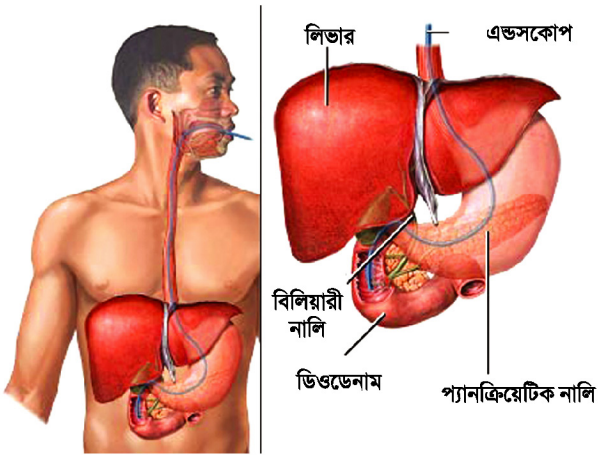

শেষ কথা

ইআরসিপি একটি কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি। এই চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপারে যথেষ্ট ধারণা না থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি কাজ করে। এ ছাড়া অপারেশনে ঝুঁকি ও খরচ বেশি থাকায় ইআরসিপি অপারেশন থেকে শ্রেষ্ঠতর ।

ইআরসিপি-এর পদ্ধতি

১। রোগীকে অজ্ঞান করা হয় অথবা ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়।
২। Endoscope (ক্যামেরা) মুখ গহ্বর দিয়ে ইসোফেগাস, পাকস্থলি হয়ে ডিওডেনামের দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত প্রবেশ করানো হয়।
৩। ডিওডেনামের দ্বিতীয় পর্ব সাধারণ পিত্তনালি এবং অগ্নাশয়নালির সংযোগস্থল তথা Ampulla of Vater -এ দৃশমান হয়।
৪। Ampulla of Vater দিয়ে একটি প্লাস্টিক ক্যাথেটার প্রবেশ করানো হয় এবং তেজস্ক্রিয় রঞ্জক প্রয়োগ করা হয়। এক্সরের মাধ্যমে সাধারণ পিত্তনালি এবং প্রধান অগ্নাশয়নালি দৃশ্যমান করে পাথর বা টিউমার বা অন্য কোন বাঁধা নির্ণয় করা যায়।
৫। অনেক সময় Ampulla of Vater -এর প্রবেশমুখ স্বল্প বিদ্যুতায়িত তার দিয়ে কেটে বড় করা হয় এবং প্রয়োজনে পিত্তনালির পাথর অপসারণ করা হয় বা টিউমার থেকে টিস্যু কেটে এনে পরীক্ষা করা হয়।
৬। তাছাড়া সাধারণ পিত্তনালিতে পাথর থাকলে বাস্কেট বা বেলুনের মাধ্যমে অপসারণ করা হয় এবং রোধকৃত বিলিরুবিন নিষ্কাশন করা হয়।
৭। অগ্নাশয় এর দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ (Chronic Pancreatitis) নির্ণয় করার জন্য ক্যামেরার মাধ্যমে প্রধান অগ্ন্যাশয়নালি অবলোকন করা হয়।

ফাইব্রোস্ক্যান ও লিভার

ডাঃ একে, এম, সামসুল কবীর
এমবিবিএস (ডিএমসিএইচ), এফসিপিএস (মেডিসিন), এমডি (হেপাটোলজি)
কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান ফর ইন্টার্নাল মেডিসিন গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল, লিভার ডিজিস অ্যান্ড অ্যাম্ভোস্কপিক ইনটারভেনশন
সহযোগী অধ্যাপক
হলিফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
চেম্বারঃ ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিক), গুলশান।

ফাইব্রোস্ক্যান কী?

মানবদেহে বিভিন্ন বিপাকীয় কর্মকাণ্ডের জন্য লিভার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর লিভারের বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ এবং তার সম্ভাব্য পরিণতি নন-ইনভেসিভ পদ্ধতিতে নির্ণয়ের জন্য যে অত্যাধুনিক মেশিনটি বর্তমান বিশ্বে চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা হলো ফাইব্রোস্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের মাধ্যমে লিভারে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বলা হয় ফাইব্রোস্ক্যান অব লিভার।

ফাইব্রোস্ক্যানে কী করা হয়?

ফাইব্রোস্ক্যানের মাধ্যমে লিভার সিরোসিসসহ লিভার শক্ত হয়ে যাওয়ার বিভিন্ন ধাপ সুচারুভাবে নির্ণয় করা যায়। এই পরীক্ষার উল্লেখযোগ্য দিক হলো লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হতে পারেন অথবা লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হতে যাচ্ছেন এমন ব্যক্তির লিভারের অবস্থা প্রাথমিকভাবেই নিরূপণ করা সম্ভব। ফাইব্রোস্ক্যান পরীক্ষার ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক লিভারের জটিল রোগ অতি দ্রুত নিরূপণের পাশাপাশি তার সম্ভাব্য জটিলতা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পদ্ধতি প্রদান এবং চিকিৎসা কতটুকু কার্যকরি হচ্ছে,তা মূল্যায়ন করা সম্ভব।

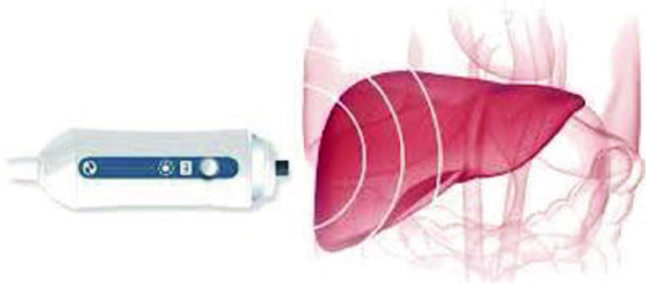

ফাইব্রোস্ক্যান পরীক্ষা প্রয়োজনীয় কেন?

লিভারের অবস্থা জানার জন্য যে কোন সুস্থ মানুষ রুটিন পরীক্ষা হিসেবে ফাইব্রোস্ক্যান পরীক্ষাটি করতে পারেন। লিভারের সে সমস্ত দীর্ঘমেয়াদি রোগের ফাইব্রোস্ক্যান পরীক্ষা করানো উচিত সেগুলো হলো–

- নন অ্যালকোহোলিক ও এ্যালকোহোলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজেস,
- ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিস (হেপাটাইটিস বি ও সি),
- অটোইমিউন হেপাটাইটিস (মহিলাদের বেশি হয়),
- প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস (মহিলাদের বেশি হয়)
- প্রাইমারি ফাইব্রোজিং কোলনেজাইটিস
- হেমোক্রোমাটোসিস,
- উইলন্স ডিজিজ ইত্যাদি

ফাইব্রোস্ক্যান কীভাবে করা হয়?

এই পরীক্ষার জন্য রোগীকে কমপক্ষে ৩ ঘণ্টা খালি পেটে থাকতে হয়। রোগী তার পিঠ বিছানায় দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বেন এবং তার ডান হাতে মাথার পেছনে লম্বা করে ছড়িয়ে দেবেন। এরপর যিনি ফাইব্রোস্ক্যান করবেন তিনি একটি পানিসমৃদ্ধ জেল জাতীয় পদার্থ পেটের ডানদিকে ওপরের অংশে চামড়ার ওপর প্রয়োগ করবেন এবং ফাইব্রোস্ক্যান মেশিনের প্রোব নামক অংশটি নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করে হালকা চাপ দিয়ে প্রোবটিকে নাড়াতে থাকবেন। নির্দিষ্ট স্থান থেকে ১০টি রিডিং নিয়ে পরবর্তীতে তা সমন্বয় করে চিকিৎসক এই পরীক্ষার ফলাফল নিরূপণ করবেন।

এই পরীক্ষার সুবিধাসমূহ কী?

- এই পরীক্ষায় অতি স্বল্পতম সময়ে (৫-১০ মিনিটে) লিভারের জটিল রোগসমূহ নিরূপণ করা যায়।
- পরীক্ষা ব্যথামুক্ত এবং কোন অপারেশনের প্রয়োজন হয় না।
- পরীক্ষাটি সহজ, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য।
- পরীক্ষাটি লিভার বায়োস্কোপি পরীক্ষার বিকাশ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- সব বয়সের মানুষের জন্য উপযোগী (শিশু থেকে বৃদ্ধ)
- পরীক্ষাটি বারবার করা যায় এবং কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ানেই।
- লিভারের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা পরবর্তী ফলোআপের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর।
- এই পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন হয় না।
- পরীক্ষাটির মাধ্যমে লিভারে চর্বির পরিমাণ জানা যায়।
- সর্বোপরি লিভারের রুটিন পরীক্ষা হিসেবে ফাইব্রোস্ক্যান একটি আধুনিক পদ্ধতি।

কোন অবস্থায় করা যায় না?

- যে সমস্ত অবস্থায় ফাইব্রোস্ক্যান করা যায় না,
- গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে
- পেটে পানি জমলে বা এসাইটিস থাকলে,
- হার্টে কোনো ইলেকট্রিক ডিভাইস (যেমন পেসমেকার) থাকলে।

বাংলাদেশে ফাইব্রোস্ক্যানের ব্যবহার

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ল্যাবএইড এই পরীক্ষাটিকে রোগীদের লিভারের রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে প্রচলন করতে সক্ষম হয়েছে। ল্যাবএইডের বিভিন্ন শাখা থেকে এই পরীক্ষার সুযোগ নিয়ে রোগীরা তাদের লিভারের বিভিন্ন জটিল রোগ অতি সহজেই নিরূপণ করতে সক্ষম হচ্ছেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা গ্রহণ করছেন।

ওষুধের গুণগতমান

ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ওষুধের "গুণগতমান" খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নতমানের ওষুধ তৈরি করতে হলে উৎপাদনের প্রত্যেকটি ধাপে অবশ্যই cGMP (Current Good Manufacturing Practice) মেনে চলতে হবে। উন্নতমানের ওষুধ তৈরিতে cGMP-এর পাশাপাশি ওষুধের 'কাঁচামাল' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কাঁচামাল বলতে API (Active Pharmaceuticals Ingredients) কে বুঝানো হয়। উন্নত API বা ভালো মানের কাঁচামাল দিয়ে তৈরি হতে পারে ভালো মানের ওষুধ, এখন প্রশ্ন, উন্নত কাঁচামাল কীভাবে পাওয়া যেতে পারে? উন্নত কাঁচামালের জন্য প্রয়োজন ভালো মানের উৎস এবং তা হতে হবে কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান দ্বারা অনুমোদিত। উন্নত মানের কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য অনুমোদনকৃত উৎস হতে তা সংগ্রহ করতে হবে। বিশ্বমানের কাঁচামালগুলোর মধ্যে DMF ও COS গ্রেডের কাঁচামাল অন্যতম।

DMF (Drug Master File): ড্রাগ মাস্টার ফাইল (DMF) একটি গোপনীয় ও বিস্তারিত নথি, যা বিশ্বের কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত। এই নথিতে একটি ওষুধের কাঁচামাল (API)-এর রসায়ন, উৎপাদন ও প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ উল্লেখ রয়েছে, যা সুনিয়ন্ত্রিত ও প্রতিষ্ঠিত একটি প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয়। যদি কোন DMF মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) দ্বারা অনুমোদন পায়, তাকে USDMF বলা হয়। আবার যদি কোন DMF ইউরোপীয়ান মেডিসিন এজেন্সি (ইএমএ) দ্বারা অনুমোদন পেয়ে থাকে, তাকে EDMF বলে।
সুতরাং DMF গ্রেডের কোন ওষুধের উৎস হচ্ছে উন্নত ও বিশ্বমানের, যা আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক।

COS (Certificate of Suitability) : সার্টিফিকেট অব সুইটেবিলিটি (COS) হচ্ছে ইউরোপীয় ফার্মাকোপিয়া (EP) কর্তৃক অনুমোদিত একটি সনদ, যার দ্বারা কাঁচামাল প্রস্তুতকারক কোন প্রতিষ্ঠান দাবি করতে পারেন যে তার উৎপাদিত কাঁচামাল ইউরোপীয় ফার্মাকোপিয়ার প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তার উৎপাদিত ওষুধের কাঁচামাল সর্বোৎকৃষ্ট।
বিশ্বমানের ওষুধ বাংলাদেশের বাজারে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ল্যাবএইড ফার্মা তাদের উৎপাদিত ওষুধে DMF ও COS গ্রেডের কাঁচামাল ব্যবহার করছে। বর্তমানে ল্যাবএইড বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি বিশ্বমানের ওষুধ উৎপাদন ও বিপণন নিশ্চিত করেছে।

Brand Name	Grade/Source
Azilab 500 Azithromycin 500 mg	COS
Bacaid 10 Baclofen 10 mg	COS
Cardinor 2.5 Bisoprolol Fumarate 2.5 mg	European Origin
Cardinor 5 Bisoprolol Fumarate 5 mg	European Origin
Cardolab 5 Amlodipine 5 mg	COS
Cephoral 200 Cefixime 200 mg	European Origin
Cephoral 400 Cefixime 400 mg	European Origin
Cephoral PFS Cefixime 100 mg/5 ml	DMF
Ciproaid 500 Ciprofloxacin 500 mg	European Origin

Brand Name	Grade/Source
Gaba-Aid 50 Pregabalin 50 mg	USDMF
Gaba-Aid 75 Pregabalin 75 mg	USDMF
Ketolab 10 Ketorolac Tromethamine 10 mg	DMF
Montilab 10 Montelukast 10 mg	DMF
Preslo-H Losartan Potassium 50 mg & Hydrochlorothiazide 12.5 mg	USDMF
Preslo-L 25 Losartan Potassium 25 mg	USDMF
Preslo-L 50 Losartan Potassium 50 mg	USDMF
Tigilo 10 Atorvastatin 10 mg	USDMF
Tigilo 20 Atorvastatin 20 mg	USDMF

অফিসে কাজ
অফিসেই গতি!

ডা. সিদ্ধার্থ মজুমদার
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, মেডিকেল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট
ল্যাবএইড ফার্মাসিউটিক্যালস

অফিসে ঢোকার পরে ফাইলে মুখ গুঁজে, কম্পিউটারে কি-বোর্ড চেপে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়! খাওয়ার জন্য খানিকটা বিরতি। আবার কাজ। একসময় দেখা যায়, কাঁধের মাংসপেশিগুলোতে ব্যথা শুরু হয়েছে। হাতও যেন আর নড়তে চাইছে না। দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার মনিটরের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখও ব্যথা করে কখনো কখনো। শরীরজুড়ে আসে ক্লান্তি...

পূর্ণোদ্যমে আর শক্তিতে অফিসের সময়টা পার করতে চাইলে মানতে হবে কিছু নিয়মকানুন। সারা দিন একটানা কাজ না করে একটু বিরতি নিন। এ সময় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো জাগিয়ে তুলতে হবে নতুন করে। এভাবে একটানা চার ঘণ্টা কাজ করা যাবে। পনের থেকে বিশ মিনিট বিরতি দিয়ে আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে পারবেন টানা দুই থেকে তিন ঘণ্টা। এভাবে কাজ করলে শরীর যেমন ভালো থাকবে তেমনি কাজেও আসবে গতি।

কীভাবে বসবেন চেয়ারে : কম্পিউটারে বসার ভঙ্গির ওপর অনেকটাই নির্ভর করে সারা দিনের সুস্থ থাকাটা। কম্পিউটারের সামনে বসতে হবে মেরুদণ্ড সোজা করে। আর চোখ বরাবর হতে হবে কম্পিউটার মনিটর। মনিটর থেকে বসার দূরত্ব হবে নিজের হাতের পুরো এক হাত। খুব হিসাব করে বললে ১৮ থেকে ২৪ ইঞ্চির দূরত্ব হবে এটি। আর পায়ের পাতা থাকবে মেঝের সঙ্গে সমান করে। এভাবে বসতে হবে ঠিকই। কিন্তু বিরতি নিতে ভুলবেন না। একটানা কাজ না করে অফিসে বসেই করতে পারেন কিছু ব্যায়াম। ব্যায়ামগুলো কীভাবে করবেন তা নিচে দেখুন।

হাত : কর্মক্ষেত্রে সারাক্ষণই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকছে হাত। হাতের ক্লান্তি দূর করতে হাত দুটো ছড়িয়ে দিন দেহের দুই পাশে। কনুই আর কবজি ভাঁজ করুন কয়েকবার। এবার হাত দুটি ফিরিয়ে নিয়ে যান আগের কাজে।

পা : বসে যাঁদের কাজ করতে হয়, তাঁদের অনেকক্ষণ পায়ের কোনো কাজ থাকে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পা দুটি নিস্তেজ থেকে পায়ের মাংসপেশিগুলো শক্ত হয়ে আসে। রক্ত চলাচলও হয় না ঠিকমতো। তাই পা দুটিকে কর্মক্ষম রাখতে সেলাই মেশিন যেভাবে চালানো হয়, পায়ের পাতা সঞ্চালন করুন সেভাবে।

কোমর : দুই হাত কোমরে রেখে আস্তে ধীরে পেছনে বাঁকা হন। মনে রাখবেন, সামনে ঝুঁকবেন না কখনোই।

ঘাড় : টানা কাজ করে গেলে ঘাড়ের মাংসপেশি, কশেরুকার সন্ধিগুলোর টিস্যু আসাড় হয়ে আসে। প্রতি ২০ মিনিট পরে ঘাড়ের মাংসপেশিগুলো স্ট্রেচিং করে আবার ফিরে যান কাজে।

যারা অনেকক্ষণ একটানা বসে কাজ করেন, তাদের সঠিক নিয়মে বসা শিখতে হবে। পায়ের পাতা, হাঁটু, কোমর ৯০ ডিগ্রি কোণে রাখতে হবে। দীর্ঘক্ষণ একটানা বসে না থেকে হেঁটে বেড়ান একটু।

সঙ্গে জেনে নিন কিছু টিপস

- ভঙ্গিগত ত্রুটি যতটা সম্ভব এড়িয়ে বসে কাজ করুন।
- লেখালেখির কাজে কাঠের সমান চেয়ারই সবচেয়ে ভালো।
- যতটা সম্ভব টেবিলের কাছে বসতে হবে।
- কোনো দিকে ঝুঁকে না বসে মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে হবে।
- ল্যাপটপটি টেবিলের মাঝে রেখে কাজ করুণ, যাতে দুই হাত ঝুলে না থাকে।
- কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপের ক্ষেত্রে সরাসরি সামনের দিকে তাকিয়ে কাজ করুণ ।
- খুব ছোট হরফে লিখবেন না, এতে ঘাড়ের ছোট ছোট মাংসপেশি শক্ত হয়ে আসে।
- কাজের ফাঁকে ২০ মিনিট পর পর ২০ সেকেন্ডের জন্য উঠে দাঁড়ান।

স্বাস্থ্যকর খাবারে লিভার সুস্থ

সালমা পারভীন
নিউট্রিশন কনসালটেন্ট
এমএসসি (নিউট্রিশন)
এমপিএইচ (এইচই এবং এইচপি, নিপসম)
চেম্বারঃ ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল, ঢাকা।

বাদাম

ওটস

সয়াবিন

চা (গ্রিন টি)

দই

লিভার (যকৃত) হলো আমাদের শরীরের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্গ, যা সমস্ত দেহের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের জন্য পিত্তরস তৈরি করা, অন্ত্র থেকে শোষিত খাদ্য উপাদানগুলো গ্রহণ ও শক্তি উৎপাদন করা লিভারের প্রধান কাজ। এছাড়া আমাদের শরীরের ক্ষতিকর উপাদানকে নির্জীব বা শরীরের থেকে বের করে দেয়াও লিভারের কাজ।

স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও লিভার

স্বাস্থ্যকর খাদ্য লিভারকে ভালোভাবে কাজ করতে এবং ভালো থাকতে সাহায্য করে থাকে। অস্বাস্থ্যকর খাবার লিভারের রোগ ঘটাতে পারে যেমন- যদি কেউ খুব বেশি পরিমাণে তৈলাক্ত খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে তার অতিরিক্ত ওজন এবং নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটিলিভার হতে পারে।

যাদের লিভারের রোগ আছে তাদেরও একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলতে হবে। কারণ স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমেই আক্রান্ত লিভার ঠিকমতো কাজ করতে পারবে এবং যে ক্ষত হয়েছে তা ঠিক করতে পারে। লিভারের স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস হলো–

- সব ধরনের খাদ্য গ্রহণ যেমন- কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন, দুধ জাতীয় খাদ্য, ফল, শাকসবজি এবং তেল।
- বেশি করে আঁশ জাতীয় খাদ্য যেমন- তাজা ফল ও সবজি, লাল চাল, আটা ইত্যাদি।
- অবশ্যই ধূমপান ও অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় বর্জন করতে হবে।

লিভার রক্ষায় ১২টি খাবার

১. বাদাম, ২. ওটস, ৩. সয়াবিন, ৪. চা (গ্রিন টি), ৫. দই (ননিমুক্ত দুধের তৈরি), ৬. ব্রোকলি, ৭. ডাল, ৮. পালং শাক, ৯. মিষ্টি কুমড়া, ১০. স্যালমোন মাছ, ১১. সবজির স্যুপ, ১২. ফলের রস।

লিভারের রোগ ও খাদ্য

যাদের লিভারের রোগ আছে তাদের অবশ্যই পরিমিত খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে শরীরের ওজন ঠিক করতে হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত চিনি ও লবণযুক্ত খাবার এবং অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার কম খেতে হবে।

সাধারণভাবে লিভারের রোগ বলতে আমরা জন্ডিস (Joundice) কে বুঝে থাকি। কিন্তু জন্ডিস হলো বিভিন্ন প্রকার লিভারের রোগের লক্ষণ যেমন–

১) হেপাটাইটিস
২) সিরোসিস

এছাড়াও লিভারের অন্যান্য রোগ হলো

১) ফ্যাটি লিভার
২) হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি

ব্রকোলি

ডাল

পালংশাক

মিষ্টি কুমড়া

স্যালমন

সবজি স্যুপ

ফলের রস

১। হেপাটাইটিস

প্রধান ভাইরাল হেপাটাইটিস পাঁচ ধরনের হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি এবং ই। যে ধরনের হেপাটাইটিসই হোক না কেন, রোগীদের পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। এ ছাড়াও এই সময় খাদ্যে উচ্চমান প্রোটিন যেমন– মুরগির মাংস, ডিমের সাদা অংশ, মাছ ইত্যাদি রোগীর খাবারে যুক্ত করতে হবে। সহজ পাচ্য শর্করা যেমন– চিনি, মধু, চাল, আটা ইত্যাদি দিতে হবে। ক্যালরি সরবরাহের জন্য তেলসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে তবে অবশ্যই সেই তেল হবে Unsaturated Fatty Oil যেমন– সয়াবিন তেল। শরীরের ভিটামিন ও মিনারেলের প্রয়োজন মেটানোর জন্য লাউ, পেঁপে, কুমড়া, গাজর, টমেটো, পালংশাক ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। আম, কমলা, পাকা পেঁপে ইত্যাদি কম আঁশযুক্ত ও সহজে হজম হয় বলে হেপাটাইটিস রোগীদের দেওয়া হয়।

২। সিরোসিস

দীর্ঘমেয়াদি হেপাটাইটিস এ বি ও সি এবং অ্যালকোহলের কারণে সিরোসিস হয়ে যায়। হেপাটাইটিস রোগের মতো এই রোগেও উচ্চমানের প্রোটিন দিতে হয়। এছাড়াও শর্করা ও তেল দিতে হবে। তবে বেশি আঁশযুক্ত খবার শরীরের জন্য ভালো হলেও সিরোসিসের রোগীদের জন্য কাঁচা ফল, লাল চাল ও আটা, বেশি আঁশযুক্ত শাকসবজি খাওয়া উচিত না। সিরোসিস রোগীর খাদ্যে অবশ্যই লবণ ও চিনি কম পরিমাণে থাকতে হবে।

রোগ	পথ্য
পিত্তনালির রোগ পিত্ত এক ধরণের তরল যা লিভারে তৈরি হয় এবং চর্বি জাতীয় খাদ্যকে হজম করতে সাহায্য করে।	• তৈলাক্ত খাবার কম খেতে হবে। • সয়াবিন, সানফ্লাওয়ার ইত্যাদি তেল হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।
ফ্যাটি লিভার লিভার বা যকৃতের কোষসমূহে অতিরিক্ত চর্বি জমার কারণেই এই রোগটি হয়ে থাকে। ফ্যাটি লিভার দুই রকম- অ্যালকোহলিক (মদ্যপানজনিত) ফ্যাটি লিভার এবং নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার।	• উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার কম খেতে হবে। • যে সব খাবারে খাদ্য আঁশ বেশি থাকে যেমন-কাঁচাফল, শাসসবজি, লাল চাল ও আটা ইত্যাদি বেশি খেতে হবে।
হেপাটাইটিস সি লিভারের এই রোগে হেপাটাইটিস -সি ভাইরাসের জন্য হয়ে থাকে।	• আয়রন কম আছে যেমন– গরুর মাংস ডিমের কুসুম, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি কম খাবে। • পরিমিত লবণ এবং বেশি লবণযুক্ত খাবার যেমন– আচার, পনির, যেকোনো টিন খাবার ইত্যাদি বর্জন করতে হবে।

লিভার আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং শুধু সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের মাধ্যমেই লিভারকে ভালো রাখা যায়। তাই আমাদের অবশ্যই অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার পরিমিত খেতে হবে এবং অবশ্যই ধূমপান ও মদ্যপান বর্জন করতে হবে।

ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতালের আয়োজনে

৫ম আন্তর্জাতিক কার্ডিওলজি ও কার্ডিয়াক সার্জারি সম্মেলন এবং তৃতীয় ঢাকা লাইভ-২০১৪

একটা সময় ছিল যখন বাইপাস সার্জারি নামটা শুনলেই মানুষজন আতঁকে উঠতেন, টাকা-পয়সা গুছিয়ে পাড়ি জমানোর কথা ভাবতেন বিদেশের পথে। কিন্তু সেই সময়টা এখন আর নেই। সরকারি স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি বেসরকারি বেশ কিছু হাসপাতাল এগিয়ে এসেছে এদেশের চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে। হৃদস্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাংলাদেশ এখন অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর হৃদরোগের চিকিৎসায় বেসরকারি হাসপাতালগুলোর মধ্যে ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল এখন অগ্রগণ্য।

ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতালের আয়োজনে গত ১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বর পঞ্চম বারের মতো আয়োজিত হয়ে গেল ৫ম আন্তর্জাতিক কার্ডিওলজি ও কার্ডিয়াক সার্জারি সম্মেলন এবং তৃতীয় ঢাকা লাইভ-২০১৪। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'Bid To Break The Barrier'। তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল গত ১৯ ডিসেম্বর রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে। এবারের সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ল্যাবএইড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. এ এম শামীম। এবারের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের ১২টি দেশ থেকে আগত ২৭ জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান কার্ডিওলজিস্ট ও কার্ডিয়াক সার্জনরা অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া আমাদের দেশের মোট ৭০ জন খ্যাতিমান কার্ডিওলজিস্ট ও কার্ডিওসার্জন তাদের হৃদরোগের চিকিৎসাসেবা বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদর্শন করেন। এদের মধ্যে ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল থেকে অংশ নেন ৩৩ জন কার্ডিওলজিস্ট ও কার্ডিয়াক সার্জন। এবারের এই সম্মেলনে সারা দেশ থেকে প্রায় এক হাজার নিবন্ধিত চিকিৎসক যোগ দেন।

তিন দিনের এই সম্মেলনে ছিল হৃদরোগের বিভিন্ন লাইভ কেসস্টাডি এবং হৃদরোগের চিকিৎসাসেবার সর্বাধুনিক সকল বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের উপস্থাপনা, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান সব কার্ডিওলজিস্ট ও কার্ডিয়াক সার্জনের সাথে আমাদের দেশের খ্যাতিমান কার্ডিওলজিস্ট ও কার্ডিয়াক সার্জনরা তাদের চিকিৎসা পদ্ধতির নানা কলাকৌশল বিষয়ক জ্ঞানের আদান-প্রদান করতে পেরেছিলেন।

সকল কর্মশালা ও বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনাগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম দিন ১৮ ডিসেম্বর ছিল প্রি কংগ্রেস ওয়ার্কশপ, দ্বিতীয় দিন ১৯ ডিসেম্বর ছিল মূল সম্মেলন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং তৃতীয় দিন ২০ ডিসেম্বর ছিল পোস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কশপ। প্রথম দিন ১৮ ডিসেম্বর প্রি কংগ্রেস ওয়ার্কশপে ছিল দুইটি সেশন। এরপর ১৯ ডিসেম্বর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন মোট পাঁচটি প্ল্যানারি সেশনের মূল সম্মেলনটি পরিচালিত হয়। অন্যতম আকর্ষণ ছিল বেসরকারি টেলিভিশন *চ্যানেল আই* এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি ও একটি হৃদরোগের অপারেশন (আংশিক) সরাসরি সম্প্রচার করেছিল।

মূল সম্মেলনের উদ্বোধন ও পাঁচটি প্ল্যানারি সেশনের পর ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম।

২০ ডিসেম্বর পোস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কশপের মধ্যদিয়ে শেষ হয় ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ৫ম আন্তর্জাতিক কার্ডিওলজি ও কার্ডিয়াক সার্জারি সম্মেলন এবং তৃতীয় ঢাকা লাইভ-২০১৪। উল্লেখ্য ২০০৫ সাল থেকে প্রতি ২ বছর অন্তর ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল আয়োজন করে আসছে এমন একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। আসছে ২০১৬ সালে আবারো এক ছাদের নিচে জড়ো হবেন দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান সব কার্ডিওলজিস্ট ও কার্ডিয়াক সার্জন।

● **মির্জা রকিবুল হাসান**

কুড়িগ্রামে শীতার্তদের মাঝে ল্যাবএইডের কম্বল বিতরণ

গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে কুড়িগ্রামের মোগলবাসা ইউনিয়নের চর সিতাইঝাড় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের মাঠে প্রায় ১২শ শীতার্ত নারী-পুরুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করে ল্যাবএইড ও তার সহযোগী অঙ্গ প্রতিষ্ঠান স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (এসইউবি)।

ল্যাবএইড গ্রুপের ডাক্তার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেয়া অর্থ দিয়ে কেনা এ সকল কম্বল এই তীব্র শীতের মাঝেও কিছুটা হাসি ফোটাতে পেরেছিল কুড়িগ্রামের চর অঞ্চলের হতদরিদ্র অসহায় শীতার্ত মানুষের মুখে।

শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন ল্যাবএইড গ্রুপের পক্ষে সাইফুর রহমান লেনিন (এজিএম কর্পোরেট কমিউনিকেশন) এবং মোগলবাসা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ডাঃ মোঃ এনামুল হক। সে সময় ল্যাবএইড গ্রুপের অন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ও গ্রামের আরো গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অগ্নিদগ্ধ রোগীদের পাশে ল্যাবএইড

গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে অগ্নিদগ্ধ ভর্তি রোগীদের জন্য অতি জরুরি নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট সরবরাহ করেছে ল্যাবএইড। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের প্রাক্তন ডিরেক্টর ও প্লাস্টিক সার্জন ডাঃ সামন্ত লাল সেন ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ রবিউল করিম খান। এছাড়া ল্যাবএইড গ্রুপের পক্ষ থেকে ছিলেন সাইফুর রহমান লেনিন (এজিএম কর্পোরেট কমিউনিকেশন) ও অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

[HOTLINE : 10606]

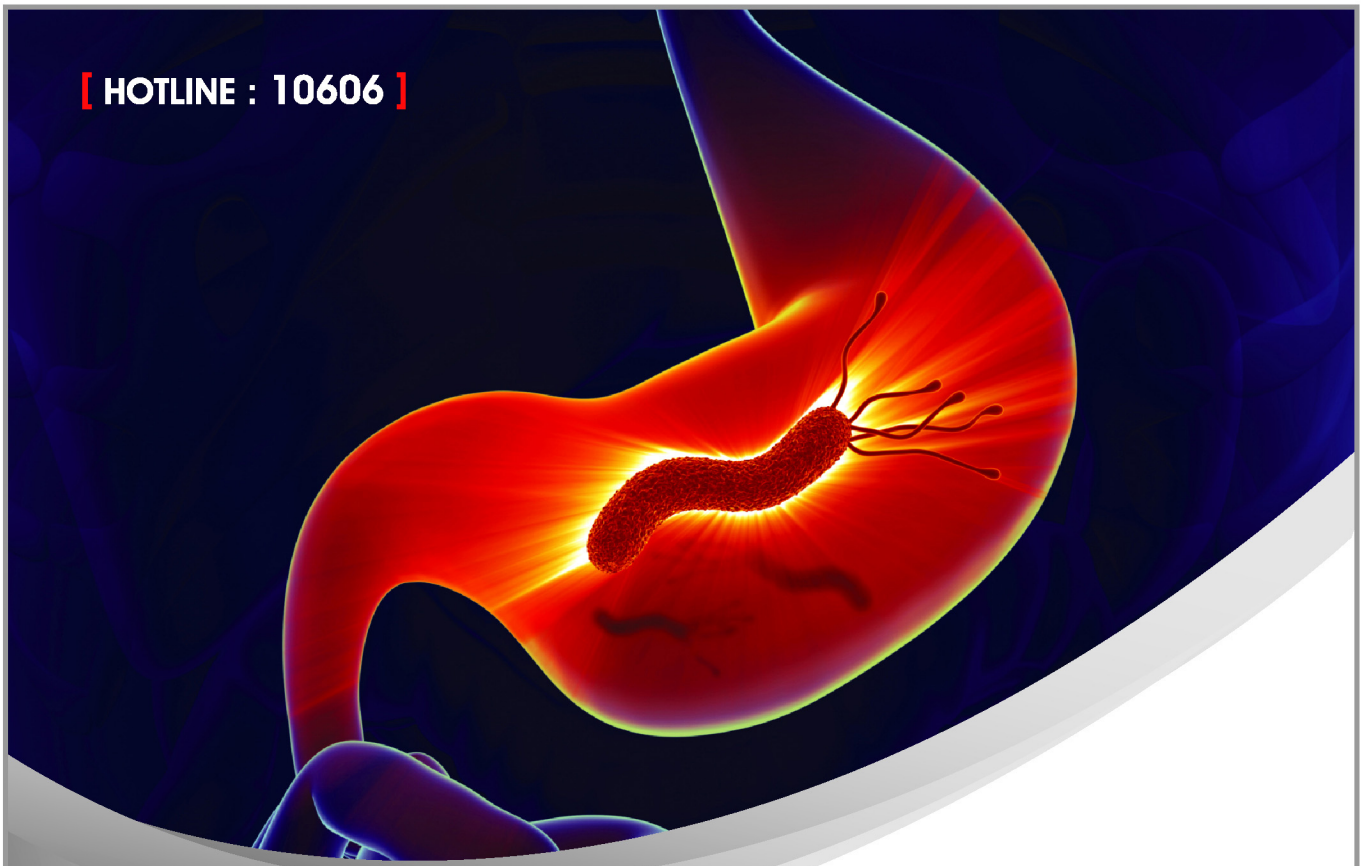

গ্যাস্ট্রাইটিস, গ্যাস্ট্রিক আলসার,
পেপটিক আলসার রোগ নির্ণয়ের সর্বাধুনিক পরীক্ষা

ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট

গ্যাস্ট্রাইটিস, গ্যাস্ট্রিক আলসার, পেপটিক আলসারের মত রোগগুলোর জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার নাম *Helicobacter Pylori (H. pylori)* এই ব্যাকটেরিয়াটির উপস্থিতি এবং এর সংক্রমন চিহ্নিত করতে ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট সবচেয়ে দ্রুততর ও কার্যকর পদ্ধতি। যেখানে কোন ইনজেকশন বা রক্তের প্রয়োজন হয় না। টেস্টটির মাধ্যমে *Helicobacter Pylori*-এর উপস্থিতি নির্ণয় হলে, চিকিৎসা প্রদানের পদ্ধতিটি অত্যন্ত নির্ভুল এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবনের মাধ্যমে রোগটি নির্মূল সহজতর হয়।

পরীক্ষাটির প্রস্তুতি:

- এই পরীক্ষাটি করতে হয় খালি পেটে, অথবা খাবার গ্রহনের নূন্যতম দুই ঘন্টা পরে।
- দুটি ব্যাগ দরকার হয়, একটি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রশ্বাস ধরে রাখে অন্যটি ক্যাপসুল গ্রহনের পরে।
- প্রথম ব্যাগটিতে অর্থাৎ বেস লাইন ব্রেথ ব্যাগের মুখ খুলে সেখানে সামর্থ অনুযায়ী সবটুকু শ্বাস ছেড়ে দিতে হবে। এবার ব্যাগের মুখটি বন্ধ করে দিতে হবে।
- ৮০ - ১০০ এমএল পানির সাথে ক্যাপসুলটা খেয়ে নিতে হবে। এবার খুব ধীরে সুস্থে অপেক্ষা করুন কমপক্ষে ৩০ মিনিট।
- এবার দ্বিতীয় ব্যাগটির মুখ খুলে, মাউথ পিস দিয়ে শ্বাস সংরক্ষন করে নিতে হবে ঠিক আগের পদ্ধতিতেই।
- সবশেষে এই দুই ব্যাগ নমুনা শ্বাস, ব্রেথ টেস্ট অ্যানালাইজার দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

• বিস্তারিত জানতে : ০১৭ ৬৬৬৬ ০৭৯০

LAB AID LTD

ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিক)

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফোন : ৫৮৬১০৭৯৩-৮, ৯৬৭০২১০-৩
ওয়েব : www.labaidgroup.com, ই-মেইল : info@labaidgroup.com

[HOTLINE : 10606]

রক্তনালী রোগের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি

ভাস্কুলার ডায়াগনস্টিক সিস্টেম

ভাস্কুলার ডায়াগনস্টিক সিস্টেম এক ধরণের পরীক্ষা, যা কাটাছেড়া ছাড়াই রক্তনালীর প্রতিবন্ধকতা সহ বিভিন্ন ধরণের রোগ সনাক্ত করে। এটা এমন ভাবে তৈরি যাতে ব্যথা ছাড়াই ধমণী ও শিরার রক্তের প্রবাহ বিশ্লেষণ করতে পারে। এটি রক্তনালী ল্যাবের পাশাপাশি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের, রক্তনালী সার্জনের বা অন্যান্য চিকিৎসকের জন্য প্রয়োজনীয় একটি পরীক্ষা।

রক্তনালী রোগ কি?

রক্তনালী রোগ হল এক ধরণের রোগ, যা ব্লক তৈরির মধ্য দিয়ে ধমণী ও শিরার রক্তের প্রবাহকে প্রভাবিত করে। এরা রক্ত ধমণী দুর্বল করে রক্তের প্রবাহকে বাধাগ্রস্থ করে।

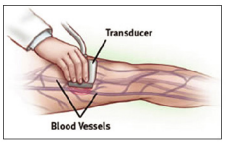

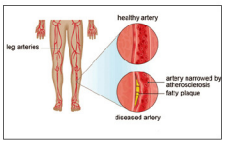

পরীক্ষাটির সুবিধা:

- শরীরের অঙ্গ এবং টিস্যুতে রক্ত প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা।
- দেহনালীর সংকীর্ণ অবস্থা খুঁজে বের করা এবং অস্বাভাবিকতা সনাক্ত করা।
- রক্ত জমাট বাধা সনাক্ত করা (যেমন: গভীর শিরাস্থ রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধা (DVT)।
- রোগী Angioplasty পরীক্ষার জন্য ভাল প্রার্থী কিনা তা নির্ধারণ করা।
- পদ্ধতির সাফল্য মূল্যায়ন করে রক্তবাহুর বাইপাস করা।
- বৃদ্ধ ধমনী (Aneurysm) আছে কিনা তা নির্ধারণ করা।
- স্থায়ীভাবে স্ফীত বা বর্ধিত শিরার উৎস এবং তীব্রতা নির্ধারণ করা।

• বিস্তারিত জানতে : ০১৭ ৬৬৬৬ ০৭০৪

LAB AID LTD

ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিক)

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফোন : ৫৮৬১০৭৯৩-৮, ৯৬৭০২১০-৩
ওয়েব : www.labaidgroup.com, ই-মেইল : info@labaidgroup.com